KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication 20/৪৮, [illegible], লক্ষ্ণৌ
Collection : KLMLGK	Publisher : সুরেশ চক্রবর্তী
Title উত্তর	Size 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ৭/২-৭, ৯ ৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৩৯ - ফাল্গুন, ১৩৩৯ আশ্বিন, ১৩৪০ Condition : Brittle ✓ Good
Editor : সুরেশ চক্রবর্তী	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সপ্তম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৯ | নবম সংখ্যা

পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

৪

যাঁহারা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন চাহেন না তাঁহাদের মত কি তাহা ত বলা হইয়াছে, এক্ষণে যাঁহারা কিন্তু পরিবর্ত্তন চাহেন অথচ শাস্ত্রের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, তাঁহারা বর্ত্তমান কালে হিন্দু-সমাজের আচার ও নিয়ম প্রভৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন চাহেন এবং কেনই বা চাহেন, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে—হিন্দু-সমাজ অনাদিকাল হইতে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতেছে—হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে প্রত্যেক মনুষ্য যেমন পরিবর্ত্তিত হয় ইহা প্রাকৃত নিয়ম, সেইরূপ সেই প্রাকৃত নিয়মানুসারেই মানুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত যে মানুষের সমাজ, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ইহা যিনি অঙ্গীকার না করেন, তাঁহার মত কোন বিবেচক ব্যক্তির পক্ষেই গ্রাহ্য নহে।

হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাত তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সনাতন শব্দের অর্থ সর্ব্বদা বিদ্যমান সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের যে সর্ব্বদা স্থিতি ইহা সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইবে, অথচ আমাদের সকলেরই ইহা বিদিত আছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের ধর্ম্ম এক নহে কিন্তু পরস্পর বিলক্ষণ। তাই মহর্ষি বেদব্যাসও মহাভারতে বলিয়াছেন

অন্যে কৃত যুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়া মপরে স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ত্বন্যএরোক্তাঃ কলাবন্যপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥

[সত্যযুগের ধর্ম্ম হইতে ত্রেতার ধর্ম্ম ভিন্ন বলিয়া স্মৃত হয়। সত্য ও ত্রেতার ধর্ম্ম হইতে দ্বাপরের ধর্ম্ম পৃথক্ এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম্ম হইতে কলিযুগের ধর্ম্মও পৃথক্ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়।]

এই প্রামাণিক বচনানুসারে এখন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম্ম প্রচলিত নাই কিন্তু ঐ তিন যুগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ধর্ম্মই কলিযুগে অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহাই যদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে এখন অনুষ্ঠিত হইতেছে না বলিয়া ঐ তিন যুগের ধর্ম্ম সনাতন হইতে পারে না, কারণ, তাহা

এখন বিশ্ব[illegible] নাই,—সুতরাং তাহা সনাতন নহে অথচ আমরা সকলেই সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের বিভিন্ন প্রকারের প্রত্যেক ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকি, এই সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, সুতরাং এই সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

এই সমস্যার শাস্ত্রীয় ও বিজ্ঞান-সম্মত সমাধান ইহাই হইতে পারে যে সনাতন শব্দের অর্থ নিত্য, সেই নিত্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে,—যথা কূটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র কূটস্থ নিত্য, ইহাই হিন্দুশাস্ত্র-সমূহের সিদ্ধান্ত। সেই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুই কূটস্থ নিত্য নহে, সুতরাং ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সনাতন ধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম কূটস্থ নিত্য হইতে পারেনা কিন্তু তাহা পরিণামী নিত্য।

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিণামী নিত্যের স্বভাব কি তাহা বুঝা যাইবে। যেমন মাটী,—মাটী ঘটাকারকে প্রাপ্ত হয়, শরার আকারকে প্রাপ্ত হয়, কখনও তাহা পিণ্ডাকারকে পাইয়া থাকে, আকারগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও মাটী কিন্তু একই রূপে ঐ সকল বিভিন্ন আকারে অনুগত থাকে,—তাহার আকারগত ভেদ থাকিলেও স্বরূপগত ভেদ কোন আকারেই থাকেনা, সেইরূপ পরিণামী নিত্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল আকার বা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সেই সকলের উপাদান বা আত্মভূত সনাতন ধর্ম্ম সকল সময়েই মৃত্তিকার ন্যায় নিজ স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। কি সত্যে, কি ত্রেতায়, কি দ্বাপরে, কি কলিতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না এই কারণেই হিন্দুধর্ম্ম সনাতন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম যে হেতু পরিণামী নিত্য, এইকারণে তাহা সনাতন।

সত্যযুগে বা অতি প্রাচীনতম বৈদিকযুগে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আকার ছিল—যাগ, দান ও হোম, যাগ শব্দের অর্থ দেবতার উদ্দেশে ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ, হোম শব্দের অর্থ বিশেষভাবে সংস্কারযুক্ত অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি দ্রব্যের প্রক্ষেপ, দান শব্দের অর্থ—যজ্ঞশালার বা যজ্ঞবেদির বাহিরে লোকের উপকারের জন্য নিজের ন্যায্য উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের নানাপ্রকার ত্যাগ—যেমন কূপ, বাপী প্রভৃতির দান।

বৈদিকযুগে যাগ ও হোম এই দুইটিই কিন্তু প্রধানতঃ ধর্ম্মের আকার ছিল। সেই যাগ ও হোম যে কতপ্রকারের ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—দর্শপূর্ণ অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, চাতুর্ম্মাস্য, বাজপেয়, অতিরাত্র প্রভৃতি অগণিত সংখ্যক যাগ ও হোমের অনুষ্ঠান লইয়া তখন হিন্দু সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত।

যজ্ঞশালা, হোমের বেদি, পুরোডাশ, বেদির নির্ম্মাণোপযোগী ইষ্টকা প্রভৃতি, কবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে? কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে? কে কোন সময়ে কিরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিবে? যজমান কে হইবে? পুরোহিত হইবার জন্য কিরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন? পুরোহিত কত প্রকারের? যাগ ও হোমে বৈগুণ্য হইলে কোন্ সময়ে কি ভাবে, কত প্রকার প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কাহার করিতে হইবে? এই সকল ব্যাপার লইয়াই তখনকার ত্রৈবর্ণিক হিন্দু সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিত, তখনকার ব্রাহ্মণ—কল্পসূত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের প্রধান ভাবে আলোচনীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ত্রৈবর্ণিকমাত্রেই তখন যথাকালে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বাস করিতে বাধ্য হইত, উদ্দেশ্য ছিল—বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল—বেদ-প্রতিপাদ্য যাগ হোমাদি ক্রিয়া-সমূহের যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞান-অর্জ্জন করিবার জন্য বার বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সামর্থ্যানুসারে গুরুগৃহে বাস করিবার নিয়ম ছিল। কেহ কেহ বা তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস করিত, বৈদিক যজ্ঞ বিদ্যার সম্যগনুশীলনই তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ যথাবিধি অগ্ন্যাধান করিতেন, প্রত্যেক ত্রৈবর্ণিক গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন, পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রমের অবলম্বন করিতেন, পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন,

ইহাই হইল বৈদিক-যুগের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আকার বা আচার অনুষ্ঠান।

বৈদিকযুগের শেষ ভাগে কিন্তু এই যজ্ঞপ্রধান আচারের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিল, যজ্ঞের পরিবর্ত্তে নানাভাবের উপাসনা ও অধ্যাত্ম চিন্তার প্রাবল্য দেখা দিল, ইহার যথেষ্ট পরিচয় আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, তাহার পর ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই যুগে স্নান-সন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, দেবতা-পূজন, অতিথি-সেবা, পূর্ত্তকার্য্য, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দর্শপূর্ণমাস অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় একান্ত আবশ্যক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত রহিল না। শ্রৌত অগ্ন্যাধানের পরিবর্ত্তে স্মার্ত্ত অগ্নিত্রয়ের প্রতিষ্ঠা অনেকেরই প্রিয় হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচার বৈদিকযুগের তুলনায় হ্রাস পাইতে লাগিল। ত্রৈবর্ণিকের সেবাই পূর্ব্বে শূদ্রজাতির একমাত্র জীবিকা ছিল, এখন অনেক শূদ্রই দাসবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নানা-প্রকার বাণিজ্যের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পর বৌদ্ধযুগ আসিল, হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রবল পরিবর্ত্তন দেখা দিল, সন্ন্যাসাশ্রম বা অধ্যাত্ম চিন্তার অধিকার ত্রৈবর্ণিকের মধ্যেই রহিল না—যাহার হৃদয়ে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইল সে যে-কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন সন্ন্যাসাশ্রমে তাহার অধিকারে আর কোন বাধা রহিল না। বহু সংখ্যক অবৈদিক দেবতা সকলের পক্ষেই উপাস্য হইতে লাগিলেন। যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির প্রতি লোকের আস্থা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল, বৌদ্ধ-শ্রমণকগণ বিদ্বদ্ব্রাহ্মণের ন্যায় হিন্দুসমাজে আদৃত, পূজিত ও শ্রদ্ধেয় বচন হইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় জাতির হাত হইতে অনেক প্রদেশেই শাসনদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল, বহু প্রদেশে শূদ্র ও ম্লেচ্ছজাতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, পরিশেষে মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোকের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসপ্রধান নবধর্ম্মের প্রতি কোটি কোটি হিন্দু নরনারী শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িল, শ্রৌত ও স্মার্ত্তযুগের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইতে বসিল, শ্রৌত ও স্মার্ত্তযুগের দেবতার স্থানে অবলোকিতেশ্বর ও মোত্রেয় প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উপাসিত হইতে লাগিল। এইভাবে বহুশত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, ক্রমে হীনযান মহাযান প্রভৃতি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার সনাতনধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবের ও আচারের প্রবর্ত্তন হওয়ায় জনসাধারণ তাহার প্রতি বিরক্ত ও বিদ্বেষপর হইতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অত্যাচার ও কদাচার-সমূহ হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে লাগিল, এই সময়েই বৈদিক-স্মার্ত্তপন্থী প্রাচীন মতাবলম্বীগণ নূতন ভাবের প্রেরণায় বদ্ধ-পরিকর হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং আচার্য্য কুমারিল ও ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম্ম নব আকার ধারণ করিয়া, নূতন রীতিতে নিজ প্রাধান্য আবার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইল। এই নব পরিবর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে কেবল শ্রুতি বা কেবল স্মৃতিরই প্রাধান্য রহিল না, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগমতন্ত্র প্রভৃতি সকল হিন্দুশাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা যে সকল আচার ও অনুষ্ঠান জনসাধারণের অধিকারের অনুকূল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা সকলেরই ভিত্তি হইল। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব নামে পরস্পর বিবদমান বিরুদ্ধসম্প্রদায়গুলি এই অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নব আকারের সনাতন ধর্ম্মনামক বিরাট-প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া চিরাগত বৈর ও বিদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক একতাবদ্ধ হইয়া বিরাট হিন্দুসমাজের নবজীবন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল। আচার্য্য শঙ্করের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই নব আকারের ব্রাহ্মণপ্রধান নবহিন্দুধর্ম্মকেই বর্ত্তমান সময়ে লোকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বিসংবাদে গ্রহণ করিতেছে। ইহার আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার মধ্যেও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার যথাসম্ভব আবশ্যক বিবরণ অগ্রে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

পাওনা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্‌তা—

['পাওনা' কথাটা বড় মধুর—যেহেতু সেটা প্রতিষ্ঠা ও আশা জাগিয়ে রাখে। আশার মত খাসা জিনিষও নেই, সেই জগতটাকে চাঙ্গা রেখেছে। এক ছিলিম্ গুড়ুক্ টান্‌তে দিয়ে—সোনার জাল্ বোনাচ্ছে!

আমার এক পরিচিত, বেজায় বুদ্ধি ধর্‌তেন। সেই সম্বলে—বহুৎ টাকা টানেন। সব টাকাই সুদে খাটতো। নিজে চাল্ বেগড়ান নি; ছেলেদের পাছে বেগড়ায়, তাই নিজের ওজনটা তাদের জানতে দিতেন না। হিসেবের খাতা রাখতেন এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে,—চাবি নিজের ট্যাঁকে। ছেলেদের বলতেন—সময় হ'লে বলে' যাব।

ছেলেরা তখন কলেজের কেল্লা ফতে করেছে, X (এক্স্) লাগাতে শিখেছে,—বাপের বহরটা X লাগিয়ে বার করেও বসে' আছে। অপেক্ষা কেবল তাঁর শুভ-যাত্রার। বড় ছেলে,—'বেবি-অষ্টিন্' পছন্দ করে ছট্‌ফট্ করছিল। মেজো,—সিনেমা হাউসের প্ল্যান্ রেডি রেখেছিল,—কিন্তু অমন 'চিত্রা' নামটি বাবার দোষে বেহাত হয়ে ফস্‌কে যাওয়ায়, মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। সাতদিন রবিবাবুর কবিতা চুঁড়ে,—'my all for' 'অতীত কথা কও'; নাঃ—শুধু 'কথা কও'ই 'enough' বলে' লাফিয়ে ওঠে। ছোট,—ইংরিজি ছাড়া কথা কইত না। কিছুতে বিবাহ করলেনা, মহৎ হয়েই রইলো, যেহেতু জগৎ মিথ্যা। উদ্দেশ্য—বাপ্ আর ক'দিন, তারপরই 'কন্টিনেন্টে' পাড়ি ধরবে এবং জোড়ে ফিরবে।

বাপ ভদ্রতা করলেন। ছ'মাসের মধ্যেই সহসা পক্ষাঘাতে তাঁর সংজ্ঞা লোপ, বাক্‌রোধ ও দুনিয়ার দেনা শোধ্। 'পাওনা'র কথা অনুচ্চারিতই রইলো! খাতাও বেরুলো না। যে বন্ধুটির বাড়ী থাকতো, তিনি সেই গভীর রাত্রে পরম নিষ্ঠার সহিত—দু'বার দুর্গানাম করে'—'বাঁচালে মা' বলে, সেখানি গঙ্গাগর্ভে দিয়ে, বন্ধুর কাজ সেরে এসে,—নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিলেন। কারণ অধমর্ণদের অন্যতমের মধ্যে খাতাখানিতে তিন্ দফায় সত্তেয়ো হাজার টাকা; তাঁর কাছেই পাওনা ছিল্। মা গঙ্গা—পতিত পাবনী।

তাই সময় থাকতে 'পাওনা'র ফর্দ্দ ফেঁদেছিলুম। নাতীরা 'মালদার' ভাবে, তাদের বলে যাওয়াই ভালো,—শেষ্ কোনদিন্ অতীত আর কথা কবে না!

বাল্যকালে মামাকে পাই। 'বোধোদয়' আর কিনতে হ'ল না। তাঁকে কেন্দ্র করেই—আমার পল্লীর পাওনা সুরু,—স্ত্রী, পুরুষ, কুলীন, কৌলীন্য, কুটিওলা ইত্যাদি।

মামা ছিলেন মস্ত কুলীন। উপনয়নান্তে নেড়া মাথাতেই, তিনি কুলরক্ষা করতে সুরু করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে দু'টি বিবাহ সেরে, আমাদের সহরতলির পল্লীতে এসে 'আওড়ে' পড়ে' যান। তা'তে তাঁর নব নব বিবাহের উঠ্‌তি-নেশা ও কুলরক্ষকের গর্ব্বের ন্যায্য দাবী, বাধা পায়,—সহানুভূতি ও স্বতীর্থের অভাব ঘটে। কারণ—সহরতলিতে—প্রকাশ্যে বহু বিবাহের আস্ফালন নানা কারণে থেমে আসছিল, কোথাও কোথাও বাহাল ছিল—গোপনে। অনুচিত কাজে লজ্জা সহজেই এসে থাকে,—ইংরাজি শিক্ষার আবহাওয়া সেই বোধটা জাগাচ্ছিল।

ভিতরে ভিতরে—মামার এবং দিদিমার কিন্তু তখনো আশ্ মেটেনি। স্বকৃত-ভঙ্গ কুলীনের অন্ততঃ তিন বিবাহ তো—মামুলী কথা, নচেৎ মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হয়! মামা সেটা মনে মনে রাখতেন। গ্রামের আন্দবাবুই রত্নের আদর জানতেন, স্বার্থ থাকলে, সমর্থকের অভাবও ছিল না। মামাকে পেয়ে, তিনি তাঁর এক কন্যাদায়গ্রস্ত আপিস্-বন্ধুর উপকারে লাগান। গ্রামে সেটা গোপনেই থাকে। প্রকাশ হওয়ায়, বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, মামা স্বপক্ষে কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আন্দবাবু veteran ওস্তাদ লোক, সহজেই বললেন—'দিনো তো সায়েবকে নারাজ করতে পারে না, সেটা বুদ্ধিমানের কাজও হ'ত না। মেম্‌সায়েবের ইচ্ছে যে। ওকে ভালোবাসেন, নিজে পছন্দ করে' তিনিই দিয়েছেন,—তাঁর সখ্। তোমরা বোঝনা, ওর ভালো হবে—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে রইলো। ওরা ভোলবার জাত নয়,'—ইত্যাদি।

তাতে,—সন্ধ্যার মেঘ, সে দিনের মত কেটে যায়।

'পাওনা'র এই পর্য্যন্তই পেয়েছিলুম,—বেশিতে লোভ ছিল না। নাতীরা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, বাকি 'পাওনা' তাবাদি হয় দেখে জোর্ তাগাদা লাগিয়েছে।

কাজেই—তারপর……]

মামার ইংরাজি শিক্ষা-সম্বন্ধে মেয়েমহলে খুব একটা বড় ধারণা ছিল। তাই তাঁর আবহাওয়ায় মানুষ করিয়া লইবার জন্য,—আবদার অনুনয় বিনয়-সহ, পেঁচো, পচা, ভূতো প্রভৃতি মাতৃ-গর্ব্বের ভাবী কেরানীদের মামার হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। তাহাতে সকাল-সন্ধ্যা আশ্রম-পীড়ার অন্ত ছিল না।—সুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা বলা চলে না।

তামাক সাজিবার ভার তাহারাই লইয়াছিল, একখানা কলাপাত আবশ্যক হইলে গাছ পর্য্যন্ত হাজির করিয়া দিত,—অবশ্য আমাদেরই বাগানের! বাগানে বানরের উপদ্রব কমিল—নরের উপদ্রব বাড়িয়া গেল। মামার কাছে 'ফ্রুটলেস্' কথার মানে শেখে, আর বাগানটিকে তার উদাহরণ বানায়!

প্রাতরুত্থানটা মামার বদ অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। 'বদ' বলিবার কারণ—তিনি তাঁর ছাত্রদের মুখে-মুখে ইংরাজি শিক্ষা দিতেন; একদিন শুনিলাম পচাকে বলিতেছেন—'Early-riser' মানে 'পেট্-রোগা'। অর্থাৎ পেট্-রোগারাই প্রাতরুত্থানপটু। শুনিয়া মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভবও করিয়াছিলাম—যেহেতু ও বদনামটি বরাবরই বাঁচাইয়া চলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বাঁচাইয়া চলিতে পারিব বলিয়া সাহসও রাখি।

বিবাহের ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, নিদ্রাভঙ্গ হইলেও মাতুল আজ শয্যাত্যাগ-বিমুখ। পড়িয়া পড়িয়া প্রশ্নোত্তর চিন্তামগ্ন ছিলেন,—মেয়েমহলে কি বলিবেন, সমবয়সী সয়তানদের সামলাইবেন কি করিয়া ইত্যাদি দুশ্চিন্তার অসোয়াস্তি তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

এইরূপ সঙ্কট সময়ে, যথানিয়ম, মাতুলের ছাত্রদ্বয় পেঁচো আর ভূতো আসিয়া হাঁকিল—"উঠেছেন কি মাষ্টার মশাই"?

উত্তর না দিয়া উপায় নাই;—চীৎকারে এখনি লোক জড়ো করিয়া ফেলিবে। বলিলেন—"আজ তো রোববার রে,—যাঃ তোদের আজ ছুটি।"

"ধোপাকে তো washerman (ওয়াশারম্যান্) বলে,—না মাষ্টার মশাই? ভূতো বলছে waterman (ওয়াটার-ম্যান্)"।

মাতুল শিহরিয়া দুর্গা দুর্গা করিলেন এবং সশব্দে ও সবেগে খিল্ খুলিয়া—"বেরো এখান থেকে" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা ছুট্ দিল।

দিনটা যে শুভ নয়—সে সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। মনটা খারাপ হইয়া গেল।

দিদি-সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ গত রাত্রে আহারের সময়, তাঁরি মুখে আন্দবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির উদ্গারগুলির আভাস, তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বর্ম্মাবৃত করিয়া দিয়াছিল। এত অল্পদিনে তাঁর ভ্রাতাকে সায়েব ও মেম-সায়েবের এতটা প্রিয় ও আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে দিনো যে কি ও কত বড় হইবে,—এই সুমধুর আশার সুমিষ্ট কল্পনা, যুগপৎ তাঁহার চক্ষে আনন্দ ও অশ্রু এবং গর্ব্বের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে চলেছিল। বাপ যে এ সব দেখে গেলেন না, সে বেদনাও তাঁকে মুহুর্মুহু পীড়া দিচ্ছিলো। কথার মধ্যে মাত্র বলেছিলেন—"আমাদের স্বখর তো"?

মাতুল এতক্ষণে বল পাইয়া—সজোরে ও সগর্ব্বে মাথা নাড়িয়া সায় দেন—'কুলের মুকুট'।

মা তাহাতে বলেন—"তা জানি, ওরা ভুল করবার জাত নয়, আমাদের ভাগ্যেই সাত সমুদ্দুর ভেঙে এসেছে। যাক্, এ সব কথা সকলকে শোনাবার দরকার নেই"; ইত্যাদি।

শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে মা তুলসী তলায় কিছু রাখিয়া প্রগাঢ় প্রণাম করিয়া আসেন। আমি তখন একমনে 'ভিকার অফ্ ওয়েকফিল্ড' পড়িতেছিলাম; বলিলেন—"এখনো পড়চিস্—শুয়ে পড়…"

সুতরাং দিদি-সম্বন্ধে মাতুল নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাড়ার মেয়েদের সকালে ফুরসৎ নেই, তাঁদের আবির্ভাব আহারান্তে। মুস্কিল—'মাই ডিয়ার'দের জন্যে, তায় আজ আবার রবিবার! আন্দবাবুর অস্ত্রই একমাত্র ভরসা।

আটটা না বাজিতেই three cheers hip hip hurray দিতে দিতে অষ্টবজ্র হাজির। ভীমের অঙ্গ হিম!

কেউ বললেন—'প্রাতঃপ্রণাম'!

কেউ বললেন—'Good morning my Lord'!

কেউ বললেন—'কি বাবা—ডুবে ডুবে water drink! ভেবেছ শিব's father won't know!'

একজন বললেন—'কি লাট্, একদম্ silent 'h' যে! A big Ram-goat-এর হুকুমটা দিয়ে ফ্যালো!'

গোবিন্দ বললেন—'Not—a, a cauple please—শুভকর্ম্মে একটা কি? তাঁর কল্যাণের জন্যেও চাই না?'

মাতুল বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া তাদের কেবল 'থাম থাম' করিতেছেন।

আমি কিছুদিন থেকে বুদ্ধির জোরে প্রায় দশ বছর এগিয়ে চলাটা এক প্রকার মানিয়ে নিতে পেরেছিলুম,—অবশ্য সকলের সম্মান যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া। আমার ভাগ্যে তাই সুযোগ মত এই সাধুসঙ্গ সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

সত্বর বাড়ির মধ্যে গিয়া মায়ের নিকট হইতে এক থাল তত্ত্বের সামগ্রী আনিয়া দিয়া বলিলাম—"আগে মিষ্টি-মুখ করুন ত, তার পরের ব্যবস্থা বড় ঘরের—কেক্ কটলেট্ চপ্। সে ওই rotten রাম-গোটের চপ নয়—পাহাড়ী মটন চপ।"

"কি রকম্ কি রকম্"?

"সে শুনবেন'খন্, আনন্দবাবু এখনো সব খুলে বলেন নি। এ নিয়ে এখন নিজেরা কিছু করে কাঁচিয়ে দেবেন না। এটা আপিসের সায়েব মেমের সখ্-মেটাতে তাঁদেরই আগ্রহে ঘটেছে। যা করবার তা তাঁরাই করবেন, তাঁরাই ভার নিয়েছেন,—ব্যস্ত হবেন না। বোধ হয় ব্রাইডকে present করবার জন্যে বিলেত থেকে একটা কিছু আসছে তারি অপেক্ষা। এই মাসের মধ্যেই gala garden party নিন্‌না……

সকলে সবিস্ময়ে শুনিতেছিলেন,—কৈলাসবাবু বলিলেন—"বলো কি—সত্যি নাকি?...

খগেনবাবু বলিলেন,—"আমিও ওই রকম শুনলুম বটে, ব্যাপারটা বুঝলুম না। তা হলে দেখছি সত্যি...

সকলের স্তম্ভিত ভাব। আগ্রহ উৎসাহের হাওয়া সহসা যেন অন্তর্মুখী হইয়া পড়িল।

একজন মামার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দাও বাবা পায়ের ধূলোটা দাও, এক 'ভোকেবলারি ভজে' জমিদারী and সুকুমারী capture! এযে দেখছি নব-কেষ্টোপাস্তির পত্তন্! দাও বাবা তোমার মাদুলিগুলো একবার পোড়া-কপালটায় ঘোষে।"

একজন বলিলেন—"না ভাই তামাশা নয়—ও আমি খুব বিশ্বাস করি।—আমাদের দেশটা ওই মাদুলির জোরেই বেঁচে আছে। দেখছোনা, একজনও মরেনা যে, ভেকেন্সি হয়।—পিটিসন্ খানা আজ তিন বছর পকেটে পোচ্‌ছে! আমাদেরই এই ছোট্টো গ্রামখানা ঝেঁটুলে পাকা আড়াই মোন মাদুলি মিলবে;—চাকরির দফা গয়া,…যাদের কোনো পুরুষে চাকরির দরকার নেই, সেই সব বড়ঘরের ক্ষীরেলা-খেগো বাচ্চাদের হাতেও পাঁচ সাতটা। কেনো বলো দিকি?

এতক্ষণে মাতুল উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"থাম্ থাম্ মুখ্‌খুর মত আর বকতে হবে না;—চাকরির জন্যে কেউ মাদুলি ধারণ করে কি না! জানা নেই শোনা নেই……

"পণ্ডিতের কথাই শোনা যাক্,—কেনো ধারণ করে please? তোমার ও গুলোই বা কেনো"?

মাতুল পূর্ব্ব ভাবেই বলিলেন—"এটা ভূতের আর এটা সাপের,—কারো সাদ্দি নেই যে কাছে ঘ্যাঁসে…

শশীবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"ওটা না থাকলেও ভূত ঘেঁশতো না, এ আমি হলপ্ করে' বলতে পারি, যেহেতু জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনা…

তারাপদবাবু বলিলেন,—"কিন্তু দ্বিতীয়টি ভারী লক্ষীমন্ত। দিনের যে রকম সময় যাচ্ছে—একটা এ-কেলে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে পড়ে বোলে! ও-তো মাদুলি নয়—হাতে জগৎ-শেঠ বাঁধা—

'লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ'—

খুব যত্নে রেখো বাবা! কে দিলে বন্ধু?"

মামাকে নীরব দেখিয়া,—খগেনবাবু বলিলেন,—"নির্ভয়ে বল বাবা—কোনো চিন্তা নেই! ভূতে তো পেয়েই আছে since…এবং সাপে খাবে এমন ভাগ্যও নয়, আর এই কটা-চোখো অন্ধদের নজরে পড়বার নসীবও আমাদের নয়,—তারা ওই মালদোয়ে মূর্ত্তিই পছন্দ করে। যতো হাজারিলাল দেখবে প্রায় সবই হিপোপোটেমস্ মডেল্। তোমার কোনো চিন্তা নেই মাতুল,—বলে' ফ্যালো…

মাতুল বলিলেন,—"কল্পিনী মাসির নাম কে না জানে,…

কৈলাসবাবু বলিলেন…

"যে না জানে—মূঢ় সে, শত ধিক তারে।"

শশীবাবু বলিলেন—"আঃ শোনোই না, বাধা দিওনা।"

মাতুল আর বলিলেন না।

কৈলাসবাবু বলিলেন—"আমি সত্যি কথাই বলেছি,—জানি যে। কথাটা হচ্ছে—দিনো মায়ের এক ছেলে।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"এবং কুলীন্ ও বহু কুলীন-কন্যার সর্ব্বনাশ করতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ। কল্যাণী মাসি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক, দয়াবতী, অন্ততঃ হতভাগিনীদের একাদশীটে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সামর্থ্যমত যতটুকু পেরেছেন—করেছেন। অতএব এই অকল্যাণ থাকতে—কল্যাণী মাসিদের, থাকাও বাঞ্ছনীয়…

চুনিবাবু চুপ করিয়া শুনিতে ছিলেন, বলিলেন,—"তুমি তো বেশ বাঞ্ছনীয় করলে, এদিকে মাদুলি-মার্কা মাণিকে দেশ ছেয়ে গেল যে! আমাদের এই বিচুলির ব্যবসাই করতে হবে দেখছি,—চাকরি আর জুটবেনা। দিনো, দেনা বাবা একটা মাদুলি-মাসি জুটিয়ে। এদেশে ও ছাড়া উপায় নেই,—ভারতচন্দ্রের ইঙ্গিতটে বুঝতে পারিনি…বসে বসে খাচ্ছি, বাড়ী ঢুকতে লজ্জা করে।"

একজন সাহস দিলেন—"লজ্জা কি রে, বড় বড় উদাহরণ রয়েছে।"

সকলেই হাসিলেন,—কষ্টের হাসি। চাকুরিই তখন ভদ্র যুবকদের একমাত্র আশা আকাঙ্ক্ষা ও সম্মানের বস্তুতে দাঁড়াইয়া ছিল। ইংরাজি পড়িলেই—অন্য সকল উপায় পশ্চাতে পড়িয়া যাইত, অমর্য্যাদার কোটায় গিয়া পড়িত; দোকান, ব্যবসা, এমন কি জমিদারী-সেরেস্তায় বাংলা লেখাপড়ার, আয়ের কাজগুলিতেও অরুচি আসিয়া গিয়া ছিল। সায়েবের চাকুরির মোহ দুষ্ট-গ্রহের মত, পূর্ব্বের জীবনোপায়গুলি, একে একে গ্রাস করিয়া গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির পথরোধ করিতেছিল। অবশ্য তার পশ্চাতে ছিল—মহিলাদের আন্তরিক sanction (সম্মতি)।

জলযোগ শেষ হইয়াছিল,—তাড়াতাড়ি পান আনিয়া দিয়া, মাতুলকে বলিলাম—"মা ডাকচেন"। তিনি উঠিলেন।

শশীবাবু বলিলেন,—"আসল কথাই বাকি রয়ে গেল,—আচ্ছা, এখন আমরাও উঠি,—পরে হবে।"

খগেনবাবু বলিলেন,—"এই সে দিন এলো a village ghost—(পাড়াগেঁয়ে ভূত),—হাত পাকালে, চাকরি বাগালে—শেষ সায়েব প্লস্ মেমসায়েব ভোলালে! And ঐ চেহারায়! নাঃ আছে কিছু…

বলিলাম—"আমি বলেছি বলবেন না, ওঁর কোমরে যে 'বিজয়-মুদ্রা' রয়ে'ছে"…

গোবিন্দবাবু বলিলেন,—"There you are,—শুনলে?—তানা তো ও-ভূত পার্ হয়!"

কৈলাসবাবু, সবিস্ময়ে বলিলেন—"বেটা রাকুসির দেশের রাজপুত্তুর নয় তো!"

চুনিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা থাক্,—তোমার ও চাঁদ-পারা চেহারায়ও হবেনা খগেন, এলবার্ট-কট্ চুলেও কাজ দেবেনা,—মাদুলি-মাসি ঢুঁড়তে হয়েছে ভাই"…

বিস্ময় ও আঘাত প্রাপ্ত গর্ব্ব সহ সকলে চলিয়া গেলেন।

মাতুল অপেক্ষা করিতে ছিলেন, বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"পাপ বিদেয় হয়েছে,—তামাক সাজ।" আমার বুদ্ধির প্রশংসাও পাইলাম।

বলিলাম,—"ব্যাপারটা আমিও যে বুঝতে পারছি না"।

বলিলেন—"কিছুই না,—কুলীনের কর্ত্তব্য কুলীনের কুল-রক্ষা করা, তাই করা হয়েছে। তাকে নিয়ে ঘর করতে হবে না তো,—এই কন্ডিসন্। বরদাবাবু ধরলেন…"

শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, বলিলাম—"কুল-রক্ষাটা কার করা হল,—মেয়ের বাপের? আর মেয়েটার সর্ব্বনাশ! যখন ঘর করতে হবে না, তখন বরদাবাবু তো নিজেই একাজ করতে পারতেন। আর—'ঘর করতে হবে না' একথা কে বলেছে, মেয়েটি?"

মাতুল সহাস্যে বলিলেন,—"কিচ্ছু বুঝিস না,—মেয়েটি কেনো বলবে,—তার বাপ…

"বে-টা তো তার বাপের সঙ্গে নয়, তিনি বলবার কে? একটি মেয়ের জীবনটা আপনি জেনে শুনে নষ্ট করতে যান্ কোন অধিকারে?"

বলিলেন—"থাম্ থাম্ কুলীনের মর্য্যাদা তো বুঝিস না, তারা যে একটা ফুল ফেলে দেয় এই মেয়েদের ভাগ্যি" !

এ সম্বন্ধে বেশী কথা কহিবার মত বয়স তখন নয়,—তবুও বর্ত্তমান মামিদ্বয়ের অবস্থা ভাবিয়া আমার অন্তরটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, প্রাণ বিদ্রোহীর মত বলিল—

"ওই যে বললেন—'মেয়েদের ভাগ্যি', সেটা কি, নতুন-মামি বললেন, না আপনারা বলেন ?"

বলিলেন—"কুলীনে পোড়লো রে;—সেটা কি কম ভাগ্যের কথা।"

"যাকে নিয়ে ঘর করা হবে না, তার 'ভাগ্যির' কথা তো বুঝলুম না মামা ! তার চেয়ে তারা জলে পড়লে যে, 'ভাগ্যি'র মানে বোঝা যায়···

উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—"থাম্ থাম্—জ্যাঠামী করতে হবে না ! আগে হিঁদুর শাস্তোরগুলো পড়্। পেসাদিকে জিজ্ঞেস করিস,—তারাও জানে"।

সত্যই জানি না, সুতরাং কথা বাড়াইয়া ফল নাই। আমাদের সহরতলী অঞ্চলে ওই-জাতীয় জীবের সংখ্যা বিরল হইয়া আসায় দেখিবার সুযোগও ঘটে নাই। কেবল বৃদ্ধদের মধ্যে—মাত্র দুই একজন তখনো আদর্শ রক্ষকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, তবে তারা দুই পরিবার লইয়া ঘর করিতেন ও নির্ব্বিকার ভাবে বাড়িতেই বস্তি-জীবনের আস্বাদ উপভোগও করিতেন। ফলে ও-প্রথাটির বাড়বৃদ্ধি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। মফস্বলের সুদূর পল্লীতেই করুণাময় কুলরক্ষকদের সাড়া পাইতাম।

মাতুল প্রসাদাতই এই নূতন লাভটি ঘটিল।

* * *

বৈকালে হাইকোর্ট বসিল,—পাড়ার মেয়েরা একে একে দেখা দিলেন। বড় ঘরের ঘোষ কন্যা—বিধবা বর্ষিয়সী, রামায়ণ মহাভারত-পড়া থাকো-পিসির মীমাংসা, সকল বিষয়েই ছিল চরম ও পরম। বেশী কথার মানুষ নন, গ্রামে শিল্পীশ্রেষ্ঠা। ফুলশয্যার তত্ত্বে সকলকেই তাঁর দ্বারস্থ হইতে হইত,—তিনিও উপস্থিত হইলেন। সোনার সরু গোটহার গলায়, পরিধানে রেলির থান, সভ্যা ভব্যা।—"কিলো ছোটগিন্নী—ব্যাপার কি" !

মা—প্রমাদ গণিলেন। সত্বর সপ্ বিছাইয়া দিয়া সকলকে বসিতে বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পানের-সাজ পেস্ করিয়া দিয়া, অকাজে এ-ঘর ও-ঘর করিতে লাগিলেন। মৃদু মিষ্ট নিরীহ স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরি দয়া বা কৃপার পাত্রী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও নাক-ই ছিল তাঁর ঘোমটার মাপ—যেহেতু এ গ্রামের তিনি বধূ।

এই নারী পঞ্চায়েৎ মধ্যে দু-একজন তাঁকে ডাক্ দেওয়ায়, থাকো-পিসি বলিলেন,—"ও বেচারি কি জানে, ওর এতে কতটা কষ্ট হয়েছে তা আমিই বুঝ্‌ছি। নিজের মেয়ে নেই, জোড়া-বাগানের মামিকে কি রকম আদরে-যত্নে রেখেছিল, তা তো সব দেখেছিস। তার কথাও বলি,—বাপের বাড়ী যেতে অত কাঁদতে কাকেও দেখিনি।—আহা মন নারায়ণ, কপাল পুড়বে কিনা ! রূপে, গুণে, কাজে-কর্ম্মে, লেখাপড়ায়—অমন বউ ক'টা দেখতে পাওয়া যায় ? দিনো কেনো এমন কাজ করলে ? সে তো তেমন ছেলে নয়।"

সকলেই মামির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষজাতি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য নিন্দা হইতে বঞ্চিত হইলেন না।

পুরুষ, বিশেষ স্বামী যে স্ত্রীজাতির দেবতা—তাঁর ইচ্ছাই আইন,—তাহা নির্ব্বিচারে ও নীরবে পালন করাই স্ত্রীজাতির কেবলই কর্ত্তব্য নয়—পরম সৌভাগ্যের পরিচয়, তাঁর অসীম আধিপত্য স্বীকার করিয়া লওয়াই ধর্ম্ম ও স্বর্গের অর্গল উন্মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, ইহাই শুনিতাম ও দেখিতাম। কিন্তু এই ঘটনা আজ তাঁহাদের এমন একটি বিশিষ্ট স্থানে আঘাত করিয়াছে, যেটা সম-অনুভূতিতে সাড়া দেয় ও সমবেদনা আনে।

তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি স্থান যে আছে, যাহা পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠে, তাহাদের ব্যবহারে ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহা জানিবার আমার অবসরই ঘটে নাই। সহজ বুদ্ধি সম্বলে তাঁহাদের স্বপক্ষে তর্কই করিয়াছি, তিরস্কৃতই হইয়াছি।

পাশের ঘরে বসিয়া স্কটের ট্যালিসম্যানে ধ্যানস্থ ছিলাম। তাঁহাদের ব্যথা-বিন্যাস ও অসহায় অবস্থার নিষ্ফল নিশ্বাস, আমার ধ্যান ভাঙিয়া কখন যে তাঁহাদের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। তাঁহাদের মর্ম্মেরও যে ভাষা আছে, মর্ম্ম যে কথা কয়—তাহা সেই প্রথম শুনিলাম এবং তাঁহাদের অসহায়তার সহিত সেই আমার সত্যিকার সাক্ষাৎ !

মামা মেয়েদের কাছে ছোটোখাটো 'হীরো' হইয়া দাঁড়াইতে ছিলেন, আজ একেবারে 'নীরো'য় নামিবার উপক্রম দেখিয়া পেসাদি বলিলেন—

"শুনেছি এর মধ্যে নাকি অনেক কিছু আছে। মামার বয়েস কি বলো ! দু'তিন বচরে লেখাপড়ায় অতো এগিয়ে গিয়েছে বলেই তো আর বয়েস বাড়েনি। সায়েবরা মাথায় করে' রেখেছে,—তাদের কথা এড়ানোও তো ওই ছেলের পক্ষে সহজ নয়;—সত্যি কথাও তো বলতে হবে" ?

রমাদি বলিলেন,—"একথা আর কেউ না বুঝুক—আমি তো না বলতে পারব না। কথা যখন উঠলো—আজ তবে বলি। জানই তো আমার ভাই কালী সিমলের পাহাড়ে বড়লাটের ডান্ হাত। খাবার পরবার সময় নেই—'কালী আর কালী'। খেতে বসবে—তাও একসঙ্গে। সবাই জানে—কালী নিরিমিষ খায়—ঘি দুধ কাঁচকলা ভাতে আর ডাল ভাতে হলেই তার হোলো। এক টেবিলে বসতে হয়—লাট-গিন্নির জেদ। সব জানে যে সুকুবার তো জো নেই—'বেরৎকাষ্টে দোষ নেই' বলে, আর হাসে। তা কালীর জন্যে কাবুলী বামুন রাখিয়ে দিয়েছে। আবার মেমসায়েব কি আমুদে, শুনে হেসে হেসে মরি,—সে কাঁচকলা ভাতে খাবেই, লাটকেও খাওয়াবে ! তা নিজের হাতে কোনো-দিন্ ছোঁয় না, চামচে করে আলগোছে তুলে তুলে নেয়। তা না তো আর এতো বড় হয়। ওরা যাকে ভালোবাসে, যার সঙ্গে হেসে কথা কয় তার কত বড় ভাগ্যি—সে কি ওদের কথা না রেখে থাকতে পারে বোন্,—তার কি নিজের বলে আর কিছু থাকে ? দিনোর আমি দোষ দিই না···

বেদে অধিকার থাকায় ব্রাহ্মণদের কোনো কাজই বাধিত না, যেহেতু অন্যের নিষিদ্ধ বস্তুতেও তাঁহাদের অধিকার বর্ত্তমান। বোধ হয় তাঁহারাই তাই সায়েবের চাকুরিটা সগর্ব্বে ও সংখ্যাধিক্যে অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সব পরিবারের ও ওই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যাদের মনোভাবও তাই সায়েবের চাকুরির অনুকূলেই ছিল।

থাকো-পিসি ছিলেন ঘোষকন্যা ও জমিদার-বংশযুক্তা। তিনি বলিলেন—"তোমরা ও সব কি বল্‌চো, এর মধ্যে—সায়েব মেমসায়েব আসতেই পারে না, তাদের জড়াও কেনো ? যারা নিজেরা দু' বে করেনা, তারা একাজে থাকবে কেনো ? ও সব বাজে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমাদের কুলীনদের যেমন কাণ্ড আছে—দিনো কিছু টাকা পেয়ে বে করে' এসেছে—

পেসাদি বলিলেন,—"আন্দবাবুকে বলতে শুনলুম যে—

উত্তেজিতা থাকো-পিসি বলিলেন—"তাহ'লে তিনি এর মধ্যে আছেন, আর তাঁরি আপন বা পরিচিত কারুর মেয়ের জন্য আমাদের নিরপরাধিনী মামির সর্ব্বনাশটি করেচেন। আর একেই তাঁরা বলেন—লোকের উপকার করা ! যাদের কোনো গুণ নেই—ভয় করি তাদেরি বেশী,—নাম কেনবার সাধ যে তাদেরও আছে। উনি কুলরক্ষার কর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—

থাকো-পিসির কথায় প্রতিবাদের অবকাশ ছিল না,—

সকলে নীরব। আন্দবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—জাপক; গঙ্গাস্নানান্তে, দেব-ভাষার দৌরাত্ম্যে পল্লী-পথ মুখর করিয়া ফেরেন। লোকের কুলরক্ষায় সাহায্য করা তাঁর কাছে মহা পুণ্যকর্ম্ম। তাঁর প্রতি থাকো-পিসির এরূপ তীব্র কটাক্ষ !

পেসাদি সভয়ে বলিলেন—"বরদা বাবুর মত না নিয়ে তিনি কিন্তু কিছু করেন না শুনেছি...

থাকো-পিসি জ্বলিয়াই ছিলেন—বলিলেন,—"দেখ্ পেসা,—সায়েবের বড় চাকরি করলেই লোকে বড় হয় না, বিষ্টু ভুঁই সায়েবের 'মিলে' মুটে ছিল, এখন অনেক টাকা করেছে,—জমিদারদের টাকা ধার দেয়, শাল গায় দেয়, কিন্তু সমাজের সে কে ? সমাজ যাকে মাথায় করে নেয়—বড় করে, সেই বড় হয়। সে অমনি হয় না,—অনেক গুণের

দরকার। তিনি আট শো টাকা মাইনে পান তাতে অপরের কি? তাই বোধ হয় এই দিকে ঝুঁকেছেন...

শিবানী বালবিধবা, আমারি সম-বয়সী। বিষন্ন মুখে বসিয়া শুনিতেছিল, পিসি তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—"ওর পানে চাইতে পারিস্ তো চেয়ে দেখ,—আমি পারিনা। ওঁদেরই কীর্ত্তির নমুনো,—জ্যান্তোকে কি করে মেরে রাখতে হয় ছাখ্। ও তখন দশ বচরের মেয়েটি, জাত গেলো বলে মা বাপ আত্মীয় পর সকলেই চিন্তিত। গঙ্গার ঘাটে ওর বাপ শোনালে—পিসি, এতদিনে নারায়ণ মুখ তুলে চেয়েছেন—শিবানীর বর মিলেছে—জমিজমা বাড়ীঘর পুকুর, সায়েবের চাকরি,—ষাট টাকা মাইনে। মস্ত কুলীন। এখন তুমি রাজি হলেই হয়,—নগদ সাড়ে তিনশো না হলে হবেনা, আর ওর মায়ের গয়না দিলেই হয়ে যায়।—হোলোও তাই···

—শিবানী নিঃশব্দে আসর ছাড়িয়া আমার ঘরে উপস্থিত,—সিক্ত চক্ষুপল্লব—মুখে হাসির প্রয়াস। "একখানা বই দেবে দাদা"? কান আমার থাকো-পিসির কথাই শুনিতেছিল,—প্রাণটা কিন্তু আমার অজ্ঞাতেই নিজের কাজ সারিয়া ফেলিল,—"কোনো কিছুই ত' তোমাকে জীবনটা ফিরে দেবেনা বোন্।"—বলিলাম "ওই আলমারি থেকে—যা পচন্দ হয় নিতে পারো"—

থাকো-পিসি তখন বলিতেছেন,—"ষাট-বাষট্টি বচরের পাত্র দেখে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরে গেলো। তখন যদি হাতে বিষ থাকতো—আমি বোধ হয় শিবানীকে তা জোর করে খাইয়ে দিতুম। সর্ব্বনাশ দেখতে দাঁড়ালুম না, তখুনি বাড়ি ফিরে যাই। রাগে, দুঃখে অসহায়ের মত কাঁদলুম,—আমি টাকা না দিলে, এ সর্ব্বনাশ হয় না,—হাতে কামড়াতে লাগলুম। বচর ফিরলোনা—মেয়েটার কপাল পুড়লো! সে আগুন জালবার কর্ত্তাও ছিলেন—ওঁরাই। বাড়ী আমার কাছে বাঁধা—এক-একবার মনে হয়···মেয়েটার যে দাঁড়াবার আর ঠাঁই নেই···বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া আমার মায়ের কাছে চলিয়া গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাও তাঁহার অনুসরণ করিল। বোধ হয় উত্তেজনাটা দমন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

সভা নীরব, স্তম্ভিত। মাতুলের কথা চাপা পড়িয়াই গিয়াছিল।—সকলে সমান বুদ্ধি ধরেন না, তাহা আশাও করা যায় না। হেমা-দি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া মাতুলকে আনিয়া সভাস্থ করিলেন। এতক্ষণে শিবানী আমার ঘর ছাড়িয়া গিয়া যোগ দিল।—থাকো-পিসি আসিলেন না। বলিলেন—"যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না,—তার আলোচনায় আর কোনো ফল নেই; বরং নতুন মামিকে এখানে আনতে বলো—দিনোর দিদির ইচ্ছাও তাই।"

মাতুল আমাকে ধমক্ দিয়া আর মেয়েদের 'ভাগ্যি' দেখাইয়া সারিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের ফুল্-বেঞ্চে তাঁহাকে 'ঝড়নাড়া' করিয়া দিল। শেষ সায়েব ও মেম-সায়েবের নাম—'রাম' নামের কাজ করিল। কিন্তু নূতন মামিকে আনিবার কথায় কিছুতেই যখন তিনি রাজি হইলেন না, তখন হেমা-দি পেসাদিকে মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিলেন—"কেমন লো—কি বলেছিলুম? তানা তো ও-জাতের এত মাথাব্যথা? আমরা এতো খুকী নই,—ভূষণো থেকেও আসিনি। মেম-সায়েব যৌতুক দেবেন!" বলিয়া বক্র হাসি হাসায়,—সকলে নির্ব্বাক—কৌতুহলাক্রান্ত,—ব্যাপার কি!

পেসাদি—এদিক ওদিক দেখিয়া সচিন্ত গাম্ভীর্য্যে মাতুলকে বলিলেন—"ঠিক্ কথা কয়ো মামা—খৃষ্টানের মেয়ে তো নয়? এ হাসি তামাশার কথা নয়, তাহলে না এনে ভালই করেছ"···

এ কি কথা! সকলের মুখ মুহূর্ত্তে বিশুষ্ক। অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হইয়া গেল! মাতুল কথাটাকে হাসিয়া বিদায় দিতে গেলেন, কিন্তু সে বিদ্যুৎ না চমকিতেই চারিদিকের ঘনঘটা,—কালবৈশাখীর গুরু-গুঞ্জনে তাঁহার মুখেই বিলুপ্ত হইয়া, নিমেষে তাঁহাকে মেঘাবৃত করিয়া দিল। কে কাহার কথা শোনে, চতুর্দ্দিকে দশ মহাবিদ্যার প্রকাশ!

আজকাল পর্দ্দায় অভিব্যক্তি দেখিয়া—অভিনেত্রীদের গুণগানে দেশ মুখর। তাঁহাদের নাম নয় দশ বৎসরের বালকদের মুখেও শুনিতে পাই,—তাহা উচ্চারণে তাহারা কৃতার্থ—কী উৎসাহ উত্তেজনায় তাহারা উচ্ছ্বসিত!

বালকেরা নিজেদের ভাণ্ডারে লক্ষ্য রাখে না,—পল্লী ও পল্লী-সমাজের প্রভাব যে কোথায় তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ বোধ হয় ঘটে নাই। সেখানেও রথী সারথি,—সুভদ্রা রুক্মিণী থাকেন—যাঁহাদের ওটা সহজ সম্পদ। তাঁহাদের চোখ মুখ ও অঙ্গভঙ্গীর কাছে ব্রহ্মাস্ত্র বিবশ, পাশুপত পরাস্ত। কবি—সতর্কভাবে 'ভবানী ভ্রূকুটি-ভঙ্গির' কথাটুকু উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। যাক্—

মাতুলকে বাতুল বানাইয়া দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

থাকো-পিসি মা'র কাছেই ছিলেন। সকলে তাঁহার নিকট গিয়া সগর্ব্বে নিজে নিজের অনুমানের সার্থকতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতা বর্ণনান্তে, মামার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্যবস্থাও দিলেন—মামা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। মাকেও আশ্বাস দিলেন,—"তুমি কি করবে, তোমার দোষ কি,তবে মামার পাতে এখন কাকেও খেতে দিওনা," ইত্যাদি।

থাকো-পিসি তাচ্ছিল্যের হাসির সহিত বলিলেন,—"কি সব ছেলেমানুষী করা হচ্ছে,—যা নয় তাই। ছোটো-গিন্নি—ও-সব কানে তুলোনা। আমি ভাবছি বড়-মামির জন্যে, তাঁর সেই সুন্দর হাসিটুকু এজন্মের মত নিবে গেলো।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে,—"এখন চললুম ছোট-গিন্নি" বলেই, চলিয়া গেলেন।

হেমা-দি ফোঁশ্ করিয়া উঠিলেন—"টাকার দেমাক্,—আর কেউ বুদ্ধি ধরে না! ঘোষের মেয়ের মুড়্লি ভালো লাগেনা। ওরা মনে মনে তো চায়ই,—আমাদের সমাজ, আমাদের জাত-জন্মো উচ্ছন্নো যাক্—সব এক হয়ে যাক্। না ছোটো-গিন্নি, সব ঠিক্-ঠাক্ খবর নিয়ে, ব্যবস্থা মতো কাজ করা চাই। তোমাকেই সাবধান হতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"তা মামা দিন কতক বারাসতে গিয়েই থাকুক্না, সে সমাজ জায়গা, দু'দিনে সব কথা বেরিয়ে আসবে। এ সব কি ঢাকা থাকে?"

পেসা-দি অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"এই সে দিন রাসবেহারী, জানা নেই শোনা নেই, বলা নেই কওয়া নেই—এক গুরুমার মেয়েকে বিয়ে করে তেজ্যপুত্তুর হোলো, আবার এ কি! ছি ছি···

মা একেবারে কাঠ্।

একটা ফাঁকা আওয়াজ, এমন দ্রুত ধূম উদ্গিরণ করিল যে শীতের সন্ধ্যাকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া পল্লীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সকলেই এই উপভোগ্য অবলম্বনটি পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবনে সহজেই নিযুক্ত হইলেন। এরূপ অযাচিত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় চিরদিনই তাঁহারা অভ্যস্ত,—নচেৎ সমাজ যে থাকে না।

মামা, ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া—সহজেই মানুষ হইবার পথ করিয়া লইল এটাও কাহারো কাহারো অস্ফুট অসুখের কারণ থাকায়, তাঁহাদের কষ্ট স্বীকারের উদারতা সুলভই ছিল। এই মহানুভবেরাই পল্লী-সমাজের প্রাণ ও প্রভাবকে সজীব রাখিতেন। বিরল হইয়া আসিলেও, এক একটি তলায়-পড়া বীজ, তাঁহাদের বংশরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

কল্‌কাতা

শ্রীপ্রণব রায়

এইখানে এসো,—আব্‌ছা-আঁধার আমার এ ছোট্ট ঘরে,
জানালার ধারে বোসো এসে চুপচাপ ;
গলির গ্যাসের ফিকে একফালি আলো
পড়ুক তোমার করুণ ক্লান্ত চিবুকে, চোখে ও
শীর্ণ, শুক্‌নো ঠোঁটে।
টয়লেট্ থাক্,—
রুখু চুলগুলি এলো খোঁপা করে' নাও,
লাল-পেড়ে সেই পুরানো শাড়িটি পরে'
জানালার ধারে বোসো চুপচাপ
আজকে সন্ধ্যাবেলা।

দারুচিনি আর লবঙ্গবন হ'তে
ঘনসুগন্ধ না-ই যদি আসে শীতল হাওয়ায় ভেসে,
না-ই যদি এল দূরসিন্ধুর ঢেউয়ের অলস গান :
দুঃখ কি আমাদের ?
নীলহ্রদজলে একখানি 'গণ্ডোলা',
মর্ম্মরে-গড়া শাদা অলিন্দে নিশীথ-চন্দ্রালোক :
সে-সব মোদের নয়।
আমাদের আছে এ মহানগরী,
পরিচিত এই পুরাতন কল্‌কাতা—
ছন্দোবিহীন কবিতা যেন এ আধুনিক জীবনের ;
আছে চিমনির কালি ও ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা সন্ধ্যেবেলা,
একটানা সেই প্রবাহ প্রত্যহের।
আর আছে এই কোটরের মতো
একতলাকার ঘর,

ভাঙ্গাচোরা আর চুণ-বালিখসা দেয়ালেতে নোনা-ধরা,
ঘুপ্‌সি, অন্ধকার।
হয়ত' এখন উঠেচে আকাশে রুগ্ন শহুরে চাঁদ ;
[হয়ত' বা দু'টি তারা !]
ছাতে গেলে ঠিক দেখতে পেতাম, থাক্—
এই আমাদের বেশ,
—ছোট-এই গৃহকোণ।
তা'র চেয়ে হেথা জানালার ধারে
বে'বা গলিটির মুখোমুখি বোসো
আজকে সন্ধ্যেবেলা ;
গ্যাসের তেরছা ফিকে একফালি আলো
পড়ুক তোমার করুণ ক্লান্ত চিবুকে, চোখে ও
শীর্ণ, শুক্‌নো ঠোঁটে।
বড় রাস্তার গোলমাল আর ট্যাক্সি-ট্রামের নানান্ শব্দ শোনো—
জনসমুদ্রে ক্ষণভঙ্গুর ঢেউ !

আর শোনো ওই—
[শুনতে পাও নি ?]
আকাশে আকাশে শিউরে উঠেচে অশ্রুত চীৎকার,
তীক্ষ্ণ তীব্র ভয়াল আর্ত্তনাদ !
কোন অরণ্যে কাৎরায় যেন
লাখো লাখো জানোয়ার,
অথবা বুঝি এ মহানগরীর শ্রান্ত বন্দী আত্মার প্রার্থনা !
ওরা চেয়েছিল—
সুন্দরী এক নারী,
একটুকু তা'র আঁখির প্রসাদ, মনে মনে পরিচয়,
মমতা একটুখানি !
চেয়েছিল ওরা নরম বুকের গাঢ় সুখ-উত্তাপ,
ভিজা শরীরের মৃদু স্বেদ-ঘ্রাণ
বাঁচবার কামনায়।

এইটুকু শুধু
শুধু এইটুকু
করেছিল প্রত্যাশা ;
তা'রি উত্তরে পেয়েচে কেবল বাঁকা হাসি আর
হৃদয়ের কৃপণতা।
তাই ওরা শুয়ে একা বিছানায়
স্বপ্ন-বিকারে প্রিয়ারে জড়িয়ে ধরে,
জেগে ওঠে ফের কুৎসিৎ দিবালোকে ;
ভেসে ভেসে চলে পথের মিছিলে
খুঁজে' ফেরে সেই চেনা-চেনা মুখখানি।
তাই যায় ওরা পণ্যনারীর দ্বারে
ব্যর্থ বিকৃত কামনার দংশনে,
মদের সঙ্গে নারীমাংস ও ঠুন্‌কো ভাড়াটে প্রেম
যেখানে বিক্রী হয়,
দর-দাম করে' টাকা দিয়ে কেনে তা-ই।

এই নগরীতে দিন-রাত ধরে'
চলেছে যা'দের ট্রাজেডির অভিনয়,
একেবারে যা'রা ফতুর হয়েচে সারাটা জীবন জীবনের জুয়া খেলে,
মরে' গেল যা'রা আকণ্ঠ পিপাসায়—
আকাশে আকাশে শিউরে উঠ্‌চে তা'দেরি কাতর অশ্রুত আক্ষেপ!
তা'দেরে স্মরণ করে'
আমার কপালে রাখো আল্‌গোছে
তোমার ঠাণ্ডা হাত।
এইখানে এসো,—আব্‌ছা-আঁধার আমার এ ছোট্ট-ঘরে,
জানালার ধারে বোসো এসে চুপচাপ ;
গলির গ্যাসের ফিকে একফালি আলো
পড়ুক তোমার চিবুকে, ঠোঁটে ও
অবগাঢ় কালো চোখে ॥

দোলা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চাণ্ডের পত্র!···

আনার মুখ এত চিন্তালেশহীন—উজ্জ্বল হাসি ভরা! তার মনেও সে ছোঁয়াচ লাগে, বলে : "এসো আনা।"

"কী বন্ধু? এখন শুয়ে!! ঐ নিয়ে মন খারাপ বুঝি?"

স্বপন লজ্জিত হ'য়ে বলে : "দূর্।—কই কী চিঠি দাও।"

—"আ-হা দিচ্ছি গো দিচ্ছি ;— একটু সবুরও সয় না! তোমার 'তার' চিঠি নয়—লণ্ডন থেকে এসেছে—বোধ হয় মঁসিয়ে চাণ্ডের।"

—"দেখি, দেখি।"

আনা চিঠিটা তার হাতে দিতে গিয়েই টেনে নিয়ে হেসে বল্‌ল : "কিন্তু বৃথা আগ্রহ মনামি, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এর মধ্যে একজনেরই চিঠি আছে—ও তার জন্মস্থান মাদ্রিদ নয়—ক্যাণ্টন।"

স্বপন ওকে এত প্রফুল্ল কখনো দেখে নি এসে অবধি। ওর মুখ-চোখে ভোরের রবিচ্ছটার ঝলমলানি। একটু অবাক হ'য়ে ভাবে এক মুহূর্ত্ত। কই, ওর মনে তো চুম্বন-পর্ব্বের পরে দ্বন্দ্বের চিহ্নও নেই? ভাবানুষঙ্গে মনে পড়ে যায় ইসাবেলার কথা! তারও তো ছিল না। মেয়েরা কি সবই এই রকম না কি? হঠাৎ কোথায় ব্যথা বাজে। দূর্, সব মেয়েরা এমন হ'তে পারে কখনো? সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে বাঙালী মেয়ের 'পরে যেন একটা নতুন ধরণের শ্রদ্ধা জাগে।

—"আঃ—কোনো বান্ধবীকে যদি কখনো বন্ধু করতে হয় যেন দার্শনিককে ভুলেও না করে। এই মন ছিল এখানে—এক লহমায় একশো মাইল দূরে—ক্যালে পেরিয়ে লণ্ডনে, কিংবা সুয়েজ পেরিয়ে—"

—"না গো না" স্বপন হেসে ফেলে। "কিন্তু দেবে চিঠিটা এখন, না ব'কেই চল্‌বে?"

কথাটা ব'লেই স্বপনের আক্ষেপ জাগে। আনা "আচ্ছা আর বকব না—"ব'লে চিঠিটা তার বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কি—স্বপন তার হাত চেপে ধ'রে বলে : "শুন্‌বে না চিঠিটা?"

—"আমার অধিকার? আমি তো কেবল ব'কে"—

—"কী যে করো আনা! প্রতি ঠাট্টায় এমন শির্‌পা তুল্‌লে—"

আনার মুখের মেঘ কেটে যায়, বলে : "মঁসিয়ে চাণ্ডের হ'লে আপত্তি ছিল না—কিন্তু অপরার হ'লে—"

—"আহা—হা—চিঠিটা আমার না—অপরার? বোসো—এইখানে আমার পাশে ডাইভানে, দুজনেই পড়ি।"

আনা একটু দূরত্ব রেখে বস্‌ল, কিন্তু স্বপন শোনে না, স'রে খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসে। আনার মুখের মেঘটা এবার সম্পূর্ণ কেটে যায়। ওর হাতের উপর বাহুর ভর দেয়—একান্ত বান্ধবী ভাবেই। কিন্তু সে-সংলগ্নতায় চিঠির খামটা খুল্‌তে খুল্‌তে স্বপন ফের অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে আর কি। খুব জোর ক'রে গাত্র-সংলগ্ন সুডৌল বাহুলতা থেকে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে মৃদুস্বরে :

"প্রিয় স্বপন,

তোমার চিঠি পেয়েই জবাব দিতে ব'সেছি। ঠিক্ যে-সময়ে তোমার কথা সব চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল সেই সময়েই কি না তোমার চিঠি এসে হাজির! তুমি 'ভক্তের ভগবান্' কথাটা মাঝে মাঝেই ঠাট্টা ক'রে বল্‌তে মনে আছে? দেখো বাংলা কথাটাও আমার মনে গেঁথে আছে। ভালো লেগেছিল কি না!

"ক'দিনই বা এখানে এসেছি! তোমার ওখান থেকে খুব দূরেও না ;—কিন্তু তবু মনে হয় কত দূরে আমরা! তোমার হয় না? আমার কিন্তু মনে হয় যে যতই কেন না আধ্যাত্মিকতার বা আত্মিক সামীপ্যের স্তব গান করি—সময় ও আকাশের ব্যবধান বড় নিষ্করুণ বাস্তব। মনকে ওরা এত বদ্‌লে দিতে পারে, না?

"একটা বড় চিঠিই লিখ্‌ব আজ। কারণ লেখ্‌বার উপাদান জমে উঠেছে বিস্তর। আর তোমাকে সেদিন অত কথা ব'লে ফেলার দরুণ ফের আরো কিছু বলার পথ একটু সুগমও হ'য়ে উঠেছে বই কি। কোনো অর্গল বহুদিন না খুল্‌লে প্রথমটায় খুল্‌তে বেগ পেতে হয়। কিন্তু একবার খোলার পর দ্বিতীয়বার খোলা অনেকটা সহজ হ'য়ে যায়ই, নয়? কিম্বা হয়ত তোমার দীর্ঘ পত্রে তোমার নানা খোলা-খুলি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের উত্তরেই দীর্ঘচ্ছন্দে নানা কথা বল্‌তে ইচ্ছে করছে? কে জানে! কিন্তু কারণ যাই হোক্ বলার মেজাজ ফের এসে গেছে। তাই তৈরী হ'য়ে নেও। কলম আমার সহজে কাগজকে চুম্বন করে না। কিন্তু যখন একবার করে তখন প্রথম প্রণয়ীর মতনই করে—নাছোড়বন্দ ভাবে।

"তুমি ক'রেছ কিন্তু বড় শক্ত প্রশ্ন। হার্মনি না শান্তি—কোন্‌টা চায় আমাদের অন্তরাত্মা?

"আশ্চর্য্য, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাকেও বড় বেশি ভাব্‌তে হ'য়েছে য়ুরোপে! দেশে আমার মনে হ'ত যে দুঃখ ব্যথা চিরন্তন নয়—ক্ষণিক, ওরা আসে যাবার জন্যে। দুঃখ পেলে তাই মনে জপ্‌তাম লাওৎসের একটা কথা:

'প্রবল ঝড় বহে কি সারা সকাল ধরি'?
প্রবল বারি সারাটি দিন পড়ে কি ঝরি'?'

কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার কেবল মনে হয় সুইনবার্ণের

'Before the beginning of years
There came to the making of men
Time with a gift of tears
Grief with a glass that ran'

'কল্প যবে সৃজিল নর ধরা
ধরিল নর বক্ষে হায় তার—
কালের দান অমর লোর ভরা
বেদন পুট উপছি' বার বার।'

"সত্যি, য়ুরোপের অফুরাণ প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনকার এই অশ্রুসম্পুটই আমাকে আঘাত করছে ক্রমশই বেশি ক'রে—যতই দিন যাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের ক্ষণিকের রঙ-চঙে দীপালি উৎসব নয়—তার পেছনের সাঁৎসেঁতে অন্ধকারই আমার কল্পনানেত্রের সাম্‌নে বেশি ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে।

"বল্‌বে হয়ত—ইসাকে পেতে না পেতে এ শ্রান্তির সুর কেন?—তাই বল্‌তেই আজ কলম ধরা। মনটা আজ একটু উঁচু তারে বাঁধা আছে—শেষ সেদিনে হোটেলে যেমন ছিল। এ-শ্রান্তির একটা প্রধান কারণই যে ও;—যদিও ও সেকথা জানে না, এবং তুমি নিশ্চয়ই এ সব কথা চিঠিতে তাকে জানিয়ে আমার শ্রান্তিভারের উপর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব চাপিয়ে দেবে না?"

আনা স্বপনের দিকে চাইল—স্বপনও ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে থেমে তার চোখের পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে প'ড়ে চল্‌ল:

"ইসার মধ্যে কিন্তু ক্লান্তির অগ্রদূতেরও কোনো চিহ্ন নেই আজ পর্য্যন্ত। ওর প্রকৃতিসৌধ অফুরন্ত প্রাণশক্তির ঠাস বুনানিতে এম্‌নি পাকা ক'রে গাঁথা যে শ্রান্তির পূরবী হাওয়া প্রবেশের একটুখানি ফাটলও পায় না। কিন্তু আমার দেহ মন প্রাণ যে একটু ভিন্ন উপাদানে গড়া, আমি যে চাই শান্তি, চাই—জীবনের মাঝে মাঝে আলস্য-ভরা উদার স্বপ্নভরা আরামকুঞ্জ, বিরামনিলয়। প্রতি নির্জ্জন পান্থশালাই আমাকে ডাকে। লক্ষ্যহীন সাঙ্গহীন গতির দৃশ্য আমাকে, কি জানি কেন, বড়ই ত্রস্ত ক'রে তোলে···একটা অনির্দ্দেশ্য বিষাদে ভ'রে দেয়।···কেন? কে জানে?

"নীসে এটা বুঝতে পারি নি। তার প্রথম কারণ: তখন আমাদের মাথার উপর বিপদের খাঁড়া ঝুল্‌ছিল। তার উপর অর্থের স্বচ্ছলতাও ছিল না। এখানে ভাগ্যক্রমে আমার কয়েকটা ছবি একজন ধনী ইংরাজ কিনেছেন। তার উপর ম'সিয়ে বেনারও আমার দুএকটা ছবি বেশ মোটা দামে বিক্রি ক'রে মোটা চেক পাঠিয়েছেন। ফলে নিঃস্ব চাং রাতারাতি অপোগণ্ড জমীদার পুত্রের মতনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়েছে অর্থ সম্বন্ধে;—তার উপর জেনেরাল সেরানোর লোক-লস্করের টীকিও দেখি না আর। বোধ হয় ওদের ঠকিয়েছি শেষটায়! অন্ততঃ বিপদ বোধ হয় আর নেই—আর আমরা তো মাস খানেকের মধ্যেই আমেরিকা হ'য়ে জাপান হ'য়ে চীন ফিরব, এর মধ্যে ওরা আমাদের গতি-বিধির খবর কোনমতেই পাবে না।

"কিন্তু ওদের ভয় কাট্‌লেও—অন্য অনেক ভয়ই তো কাটেনি। আর একটা মস্ত ভয় হচ্ছে ফের,—ইসার জন্যেই। ও কি সত্যি সুখী হবে আমাদের মিলনে? এ আশঙ্কা আমার ছিল বরাবরই—কেবল ও আমাকে ভরসা দিত নানা ছাঁদে—বুঝতেই পারছ, যেমন উচ্ছ্বাসিনীরা প্রেমের উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে দিয়ে থাকে প্রথমটায়।

"ও যে মিথ্যা বলত তা-ও নয়। কেন না এ-অঙ্গীকার ও যখন করেছিল তখন ক'রেছিল তাজা হৃদয়রক্ত দিয়েই—যার মধ্যে আর যারই অভাব থাকুক না কেন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব যে নেই এটা নিশ্চিত। কিন্তু মুস্কিল কি জানো ভাই? মুস্কিল এই যে প্রেমের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার শপথ প্রভৃতি একেবারেই নামঞ্জুর। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাক্ষর—কালির, সে শুকোলেই হয় পাকা। কিন্তু প্রেমের স্বাক্ষর যে—রক্তের; সে পাকা থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ রক্ত থাকে কাঁচা শুকোলেই সে-সইয়ের মূল্য যায় উবে। আমার মনে কেবল একটা প্রশ্ন মাঝে-মাঝে উদয় হয় গোধূলির বিষাদ সুরে: প্রেমের দলিলের প্রবৃত্তি যা-ই হোক্ না কেন মানুষ তাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ল না কেন আজ অবধি? কেন এমন কালি উদ্ভাবন করতে পার্‌ল না যা সবরকম আবেশের দলিলেই নিজের ছাপ রেখে যেতে পারে?

"ভুল বুঝো না কিন্তু। বল্‌ছি না ও আমাকে ভালোবাসে না আর। বাসে—অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত খুবই বাসে। কিন্তু সেইজন্যেই যে ভয় বেশি ক'রে বাজে ভাই: ও আর আমি যে-রকম ভিন্ন উপাদানে গড়া তাতে আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ টানে আমাদের প্রেমের এই নিবিড়তাই কি সবচেয়ে দুঃখ পাবে না? শেষ অবধি কে জয়ী হবে?—আমাদের গঠন-প্রকৃতির বিমুখতা—না প্রেমের চুম্বক? যেখানে ভালবাসার কাছে দুজন চায় দুরকম বর সেখানে কোন্ বরদাতা মিল ঘটাবে? কে বল্‌বে?

"মনে পড়ে এই সূত্রে ম'সিয়ে বেনারের একটি কথা। তিনি বল্‌তেন যে গেটে ঠিক্‌ই ব'লেছিলেন যে 'Es gibt Menschen, die ihr gleiches lieben and wieder solche die ihr Gegenteil lieben and diesem nachgehen'.

'কেহ হেথা চায় আপনারি ছায়
লখিতে দয়িত-মুকুর মাঝে,
যার মাঝে হেরে বিপরীত—ফেরে
কেহ বা উছসি' তাহারি পাছে।'

"আমি—বোধ করি তুমিও খানিকটা এই প্রথম দলের লোক। এবং ইসা—পুরোপুরি এই দ্বিতীয় দলের।

"তাহ'লেই সমস্যাটা বুঝছ আশা করি। ও আমাকে ভালবাসে আমি ওর থেকে এত ভিন্ন ব'লে, কিন্তু আমার কোথায় থেকে থেকে নৈরাশ আসে ওর সঙ্গে আমার সাদৃশ্য এত কম ব'লে। অর্থাৎ যে কারণে ওর ভরসা এত বেশি যে আমরা ক্রমশ পরস্পরের কাছেই আসব ঠিক্ সেই কারণেই আমার শঙ্কা—আমরা দূরেই সরে যাব উত্তরোত্তর।

"কেন দূরে স'রে যাব মনে হয়?—আজ একটু বিশদ ক'রে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু সাবধান! আমিও যে সেন্টিমেণ্টাল হ'তে পারি তুমি হয়ত ঠিক্ কল্পনা করতে পারো না, [illegible] কি? এমন কি ওকে নিয়ে যে রীতিমত একটা ছোটো-খাটো ড্রামাটিক সীন করতে পারি?—পারো কি ভাব্‌তে? শোনো বলি সে-কথা।

"না,—তার আগে বলি কী ভাবে একটু একটু ক'রে আমাদের মধ্যে একটা অনিবার্য্য ব্যবধান এসে পড়ছে ক্রমশঃ। দুএকটা উদাহরণ দিয়েই সুরু করব।

"ওকে নিয়ে সেদিন বুদ্ধের একটা ফিল্‌ম্ দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখে যে কী খারাপ লাগ্‌ল তা বল্‌তে পারি না। বুদ্ধ গোপার সঙ্গে সরবৎ খাচ্ছেন, এক বন্ধুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন, চাকর-বাকরকে বখ্‌শিশ্ দিচ্ছেন ইত্যাদি জিনিষ বাস্তব-বাদী প্রযোজক দেখিয়েছেন বুদ্ধের যৌবরাজ্যের ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ফোটাতে। কিন্তু আমার মন এসব দেখ্‌তে না দেখ্‌তে ধিক্-ধিক্ ক'রে উঠ্‌ল। ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে ইসাকে বল্‌লাম। কিন্তু ও তো অবাক্। বল্‌ল: ওর এসব খারাপ তো লাগেই নি, বরং ভালোই লেগেছে—কেন না এতে ক'রেই ওর কাছে বুদ্ধের ছায়াময় চরিত্র এত জীবন্ত, এত বাস্তব হ'য়ে উঠেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি চুপ ক'রে গেলাম, কোথায় যেন খচ্ ক'রে বাজ্‌ল। ও বুঝ্‌ল, আদর ক'রে আমার একটা হাত

চেপে ধ'রে বল্ল: 'কেন তোমার এত খারাপ লাগল চাই চাই?' আমি বোঝাবার ভাষা খুঁজে গেলাম না। যে-বুদ্ধ আমার জীবনে তারার মতনই নিষ্কলুষ সুদূর শুভ্রতায় মণ্ডিত তাঁকে সরবৎ খেতে বা চাকরকে বক্শিশ্ দিতে দেখার মধ্যে যে-ইতরতা আছে সেটা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবো কী ভাই? যা দরদ দিয়ে বোঝবার—যুক্তি দিয়ে তার নাগাল কেউ পেয়েছে কি কোনোদিন? শুধু এসবই না—আমি অনুভব করলাম বিপুল অতীতের ছায়া পটভূমিতে যে-বুদ্ধ দেদীপ্যমান্ তাঁকে সমসাময়িকতার সান্নিধ্যের আলোয় দেখার মধ্যে—কল্পনা করার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ইতরতা আছে মনে হ'ল। কিন্তু যেহেতু একথা বল্তে গেলে বে-দরদীর কাছে বড্ড বাড়াবাড়ি মতন শোনায় সেহেতু শুধু বুদ্ধের সরবৎ খাওয়া প্রভৃতি দৃশ্যের তুচ্ছতার কথাই বল্লাম একটু।

"কিন্তু তাতেও ইসা কোনোমতেই মান্বে না,—কোমল সুরে বল্ল: 'বুদ্ধ যখন সরবৎ নিশ্চয়ই খেতেন—তখন ছবিতে তা দেখালে কেন এত লাগে তোমার চাই চাই?' আমি একটু শুষ্কসুরে বল্লাম: 'আমার লাগে—এর বেশি কিছু বল্বার নেই ইসা।' ও একটু আহত হ'য়ে আমার কাছ থেকে একটু দূরে স'রে বসল। অগত্যা আমাকে নরম হ'তে হ'ল—ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর- ক'রে বল্লাম: 'ইসা, তোমার বক্তব্য আমি বুঝেছি, কিন্তু আমার স্পর্শকাতরতাটা যে তুমি একটুও বুঝলে না!'—ও ঠোঁট ফুলিয়ে বল্ল: 'অবজ্ঞা ক'রে উত্তর দেবেন না—আবার বলবেন আমিই বুঝলাম না; সব দোষ এই ভাগ্যহীনাদেরই তো—নইলে আর কার বলো?' আমি বল্লাম: রাগ কোরো না ইসা, কিন্তু এসব তো ব'লে বোঝাবার কথা নয়। যাহোক্ যখন না বল্লে তোমার মান ভাঙবেই না তখন বল্তেই হবে—যদিও বলা এত কঠিন।' ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লাম: 'কি জানো ইসা? বুদ্ধ হয়ত জীবনে সরবৎও খেয়ে থাক্বেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইয়ার্কিও দিয়ে থাক্বেন—কিন্তু তাঁর যে-গরিমা ইতিহাসের আঁধার দিগন্তরে নির্ম্মল নক্ষত্রের মতনই চির-ভাস্বর—সে-যুগসঞ্চিত মহিমার সঙ্গে এধরণের ভাল্গার ঘটনা একেবারেই খাপ খায় না। অন্ততঃ আমার এতে এতই বাজে যে এ-ধরণের মহাপুরুষদের ছবিতে এভাবে দেখানো আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া সাধারণের একটা নাগরিক কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। ও এ-উষ্মায় একটু আশ্চর্য্যই হ'য়ে বল্ল: 'কিছু মনে কোরো না চাই চাই, কিন্তু আমি ঠিক্ বুঝতে চাই এতে এতখানি বাজেই বা তোমার ঠিক্ কোথায়, আর মহাপুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা কাহিনী ছবি নাটক প্রভৃতিতে ফুটিয়ে তুল্লে তাঁদের মহিমা খর্ব্ব হয়ই বা ঠিক্ কোন্ খানে?' আমি তার প্রশ্নোৎসুক নীরবতায় বাধা হ'য়েই বল্লাম: 'ইসা, এসব বলা এত মুস্কিল, প্রমাণসহ তো নয়।' ও বল্ল: 'তা হোক্ বলো।' আমি বল্লাম: 'ইসা, আমার মনে হয় যে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে দৈনন্দিন নিরায়ু নগণ্যতা কালের চিরন্তনতার অতলে ডুবে গেছে তা ডুবে-যাওয়াই ছিল মহাকালের অভিপ্রেত। নইলে তাঁর শাশ্বত জ্যোতিষ্ক-দ্যুতি লক্ষ কোটি চির বিস্মৃত মানুষের অন্তরাকাশে এমন অবিস্মরণীয় আভায় জল-জল করত কি? আমাকে ভুল বুঝো না:—আমি বল্ছি না বুদ্ধ সরবৎ কখনো খাননি, বা খরগোস শিকার করেন নি, বা চাকর-বাকরকে বখ্‌শিশ্ দেন নি; আমার বক্তব্য—বুদ্ধের যে-শুভ্র দীপ্তির পাশে এসব তুচ্ছ স্মৃতি পাণ্ডুর হ'তে হ'তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে সে-দীপ্তিতে শুভ্র রাখার জন্যেই এ-সব তুচ্ছতাকে আমাদের ভোলা চাই।' ইসা বল্ল: 'কিন্তু বাস্তব'—আমি বাধা দিয়ে ঈষৎ শুষ্ক সুরে বল্লাম: 'য়ুরোপে ঐ এক ধুয়ো উঠেছে—বাস্তব, বাস্তব, বাস্তব! আমার সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে যে তোমরা একবারও ভেবে দেখ না যে জীবন পদে-পদে বাস্তবের দাবীতে দেউলে হয় ব'লেই কল্পনাকে যুগে-যুগে ভার নিতে হয়েছে তাকে উর্দ্ধে তুলে ইতরতার ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখ্‌বার। পাঁকের মধ্যে জন্মায় ব'লেই সূর্য্যমুখীর পুষ্প-গৌরব নয়—পাঁককে অস্বীকার ক'রে উর্দ্ধ অভীপ্সাকে বরণ ক'রে তার আলোর দল মেল্তে জানে ব'লেই ওর মহিমা।' ইসা বল্ল: 'কিন্তু মানুষের মানবতা কি অমনি ধারা পাঁকেরই সামিল্ বল্তে চাও—যে তার মধ্যে জন্মাবার ইতিহাস বুদ্ধের মতন মহাপুরুষকেও প্রাণপণে লুকোতে হবে? না, পৃথিবীর আবেষ্টনী এমনই দূষিত যে সে

ছোঁয়াচ লাগ্‌তে না লাগ্‌তে অমন নক্ষত্রদ্যুতিও পাণ্ডুর হ'য়ে যাবে? আর যদি তা ই হয় তবে আমি বল্ব দেউলে হ'ল পাঁক না—সূর্য্যমুখী, মানুষের মানবতা না—দেবতার দেবত্ব। বিশেষ ক'রে এইজন্যে—যে যে-দেবত্ব এত নিঃসহায় যে একটুতেই মূর্চ্ছা যায় তার দেবত্বই যে খানিকটা নামঞ্জুর হ'য়ে গেল। শক্তির ঐশ্বর্য্য না থাক্লে দেবতা শয়তানের সঙ্গে যুঝবেন কোন্ হাতিয়ার নিয়ে শুনি? কান্নার?'

'কথাটার মধ্যে সত্য আছে মান্তেই হবে, কিন্তু আমাদের এ দুই মতামতের সত্যাসত্য তৌল ক'রে দেখাতেই এ-তর্কের অবতারণা করি নি। এ দৃষ্টান্ত দিলাম দেখাতে—ওর আর আমার দেখার-ভঙ্গীর মধ্যে কী-ধরণের দুস্তর ব্যবধান। আর এ-ব্যবধানের 'পরে জোর দিচ্ছিও শুধু বোঝাতে যে জীবনে এই দেখার-ভঙ্গীর সাদৃশ্যের উপর অন্তর-সামীপ্য কতখানি নির্ভর করে।'

আনা ব'লে উঠ্‌ল: "একথা আমি মানি না কিন্তু। এখানে ইসাবেলাই ঠিক্ ব'লেছে। নরনারীর দেখার ভঙ্গীর সাদৃশ্যই তাদের অন্তর-সামীপ্যের সব চেয়ে বড় সহায় নয়।"

স্বপন তার দিকে চেয়ে বল্ল: "কিন্তু চাং তো বলছেই যে এখানে কার দেখার ভঙ্গী ঠিক্ সেটা অবান্তর।"

—"কিন্তু ও যে বল্‌ছে দুজনার দেখার ভঙ্গীর সাদৃশ্য না থাক্‌লে তারা পরস্পরকে ভালো বাস্‌তেই পারে না। একথা কী ক'রে মেনে নেব? নরনারীর মধ্যে যেটা চুম্বক র'য়েছে তার গুহ্য তত্ত্ব কি এই ধরণের বুদ্ধিঘটিত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই নিহিত বল্‌তে চাও? না, এই ধরণের তর্কবিচারের বালু-ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা?—ও একটা কথাই না।" আনা খুব জোরে ঘাড় নাড়ল।

—"কিন্তু এসব কি ঠিক্ বুদ্ধিঘটিত ব্যাপার আনা? না, সূক্ষ্ম অনুভবের, সাড়া দেওয়ার, দরদের রাজ্য? এখানে গরমিল হ'লে মানুষ যে আঘাত পায় তা কি তুমি অস্বীকার করো? বুদ্ধকে পূজার যে ভাব আমাদের—ওরিয়েন্টালদের—অস্থি মজ্জায় উপ্ত—তাকে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে যদি বর্ত্তমান যুগের বৈশ্যের দল ছবিঘরে দেখায়—যদি বুদ্ধের বৌদ্ধতাকে তারা ভাঙিয়ে খেতে চায়—"

—"বুদ্ধের সম্বন্ধে ও যা ব'লেছে আমি মানি, কিন্তু সেটা তো আসল প্রশ্ন নয়। আসল কথা হচ্ছে ইসা যা ব'লেছে—বাস্তব—"

স্বপন বাধা দিয়ে বল্ল: "চাং বোধ হয় বল্তে চাইছে—হৃদয়ের এই সব গভীর দরদের রাজ্য, স্বপ্নের আকাশ মানুষের বড় আদরের। ধুলোবালির রাজ্যে বে-মিল বিরুদ্ধতা সওয়া যায়—কিন্তু সব সত্য হৃদয়-সম্বন্ধের উর্দ্ধ-আকূতিই যে পাখা মেল্তে পায় কেবল এই কল্পনার আকাশে। এমন কি বাস্তবতার অপ্রতিবাদ্য ভিত্তির 'পরে দাঁড়িয়েও একথা বলা যায়—মানো না কি?"

আনা একটু ভাব্‌ল, পরে বল্ল: "আচ্ছা, এ-তর্ক এখন রইল চাপা, তুমি শেষ করো আগে চিঠিটা—উঃ, কী লম্বা চিঠি!"

—"যদি ক্লান্তি লাগে—"

—"না না—বড় সুন্দর ফরাসী লেখে ও—ওর বল্বার ভঙ্গীও এত সুন্দর যে—পড়ো পড়ো।"

স্বপন খুসি হ'য়ে পড়তে লাগ্‌ল:

"এ শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, যাতে ক'রে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা তোমার পক্ষে একটু সহজ হয়। কিন্তু এরকম গরমিল আমাদের মধ্যে এত বেশি হয় আজকাল—প্রায় পদে পদে ব'ল্লেও হয়—যে একটু কথা কাটাকাটি ক'রেই সমাপ্তি টান্তে হয়—মুখে স্বীকার না করলেও দুজনেই মনে মনে মান্তে বাধ্য হই যে আমরা ঠিক্ এক-জগতের বাসিন্দা নই। অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারতাম, কিন্তু তা বাহুল্য হবে ব'লে আর একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

"তুমি জানো ইসা বহুবল্লভা—প্রকৃতিতে। ও মনে করে এই-ই স্বাভাবিক—বিবাহ প্রথাটাই একটা অস্বাভাবিক জিনিষ, একটা প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার প্রাণপণে বেঁচে থাকার অক্ষমনীয় প্রয়াস। জানো—আমি ওকে এখনই বিবাহ করতে চাই, শুধু ও রাজি নয় ব'লেই বিবাহ এখন স্থগিত আছে—ওর ধুয়ো free love, companionate marriage, আরও কত কী।

"তোমার সঙ্গে বিশেষ ক'রে companionate

marriage নিয়ে ওর যে তর্ক হ'য়েছিল তা ও আমাকে ব'লেছে। তুমি ব'লেছিলে যে আনার আদর্শ ছিল একটা সত্যিকার আদর্শ—যেখানে বিচারপতি লিণ্ডসের companionate marriage-এর উদ্ভাবনটা একটা বৈশ্য ব্যবস্থা মাত্র, যেমন ব্যবস্থা হচ্ছে ভালো করে ভাঁড়ার রাখতে জানা বা গৃহস্থালী চালানো।"

স্বপনের দিকে চেয়ে আনা হঠাৎ ভারি মিষ্টি হাসে··· স্বপনের রক্ত ঈষৎ দ্রুত বয়···সে তার জানুর উপরে ন্যস্ত আনার হাতটি মুঠোর মধ্যে নিবিড় ক'রে চেপে ধ'রে প'ড়ে চলে:

"আমি ওকে বলি: স্বপনের কথা খুবই ঠিক্। ও জোর ক'রে বলে: কখ্খনো না, বলে: ভালোবাসার যে বাহ্য-ব্যবস্থার দিক্ আছে তার উপর টানের স্থায়িত্ব নির্ভর করেই। আমি বলি: ভালোবাসাকে যদি ভিতরের জিনিষ ব'লে মানি তবে এ-ও মান্‌তেই হবে যে বাইরের অব্যবস্থাকে জয় ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সে শক্তি রাখে। ও বলে: এ আমার অত্যন্ত আন্-প্র্যাক্‌টিকাল কথা—স্বপ্নাদর্শীর মতনই বুলি মাত্র—যেহেতু এর সত্যতাকে জীবনের সাক্ষ্য--la Vie—প্রতিপদেই নাকচ ক'রে এসেছে আবহমানকাল।'

আমি বলি: Tant pis pour la Vie * ; ও তাতে রুখে উঠে বলে: আকাশে মাথা ঠেকাটা হ'য়ে ওঠে একটা উদ্ভট ব্যাপার যদি পা মাটির পরে নোঙর খুঁজে না পায়।"

আনা ব'লে উঠ্‌ল: "একথার আমি সায় দেই কিন্তু। এ-ই-ই য়ুরোপের কথা।"

স্বপন বল্‌ল: "কিন্তু তুমি ফের সেই অবান্তর প্রসঙ্গ এনে ভুল করছ আনা। চাং য়ুরোপের বা এশিয়ার কথার সত্যাসত্যের ওজন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না·—ওর লক্ষ্য ওদের দুজনের আদর্শগত ভেদ দেখানো।"

—"কিন্তু আদর্শ বাস্তবকে ছেড়ে বাঁচে কী ক'রে এ-প্রশ্ন তো আর এক্ষেত্রে ঠিক্ অবান্তরও নয়?"

—"তা নয়, কিন্তু এর উত্তর বোধ হয় এই যে চাঙের আদর্শ স্বপ্নজীবী এটা ধ'রে নেওয়াটাই হচ্ছে তোমার অযৌক্তিক। কেননা চাং যা-ই হোক্ না কেন নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে বলবে আমাদের বায়ুভুক্ হ'য়ে ইন্দ্রধনুর দিকে তাকিয়েই কবিত্ব করলে থাসা চ'লে যায়। ও শুধু বল্‌তে চায় যে মানুষ বাস্তবে যতই আপোষ করুক না কেন—চিন্তাজগতে আদর্শ জগতে সত্যানুসন্ধানে তাকে হতেই হবে খানিকটা একরোখা, এমন কি খানিকটা অসহিষ্ণুও বই কি। আমার মনে হচ্ছে তুমি ও ইসাবেলা একটু অস্থানে তোমাদের stress-টা দিচ্ছ ব'লেই তালে এত গরমিল হচ্ছে।"

আনা হেসে বল্‌ল: "আর তুমি ঠিক্ তালে তালে পা ফেলছ, এই তো?"

স্বপনও হাস্‌ল, বল্‌ল: "অন্ততঃ তোমাদের দুজনার চেয়ে বোধ হয় কম বেতালা ফেলছি। তবে হয়ত—Once an Oriental always an Oriental—না?" তার কথার মধ্যে একটু ঝাঁঝ ছিল যেন।

আনা তার চোখের 'পরে চোখ রেখে বল্‌ল: "ছি স্বপন, বার বার ওকথাটা কেন বলো? ওরিয়েন্টাল বল্‌তে আমি নিন্দনীয় কিছু বুঝি কখনো?"

স্বপন তার হাতের 'পরে আদর ক'রে দুটো চাপড় দিয়ে পড়তে লাগল:

"দেখেছ মুস্কিল? এটা তো আসলে সত্য নির্দ্ধারণের সমস্যা নয়—গোনাগুন্তি ওজন করা-করিরও প্রশ্ন নয়—যে নিষ্পত্তি হবে বাইরের কোনো মাপকাটি থেকে! এযে ভিতরের গরমিল স্বপন। বুঝ্‌ছ কি কোথায় আমার এত একলা মনে হয় আজকাল থেকে থেকে?"

আনা অস্ফুট সুরে বল্‌ল: "বেচারী।"

স্বপন তার হাতটা আরও আর্দ্রভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে প'ড়ে যেতে লাগ্‌ল:

"তাই শ্রান্তির কথা বল্‌ছিলাম। ও আমাকে ভালোবাসে না এমন কথা আমি বলি না। আমি যদি আজ হঠাৎ জলে ডুবি ও হয়ত মরিয়ার মতনই ঝাঁপ দেবে। ওযে পুরুষকে দেখে আকৃষ্ট হয় এখনো—তাতেও আমি মর্ম্মাহত হই না। কেবল ওর মধ্যে এ-প্রাণচাঞ্চল্য একটু কম্‌লে আমি সুখী হ'তাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু আমি ওর

* তাহ'লে জীবনেরই দুর্ভাগ্য সেটা।

ভালোবাসায় বিশ্বাস করি—শুধু জানি ওর ভালোবাসার ধরণ আমার থেকে পৃথক্।

"কিন্তু এই খানেই না ট্রাজিডি, স্বপন। কেন জানি না আমার নিরন্তরই মনে হয়—যে কথা তোমাকে সেদিন রাতে ব'লেছিলাম—যে আমাদের সাম্‌নে র'য়েছে পরী-প্রাসাদ—কেবল চাবির উদ্দেশ মেলে নি। কেবল এইটুকু মনে হয় যে এ-চাবি আছে ওই ভালোবাসারই কাছে—মানে, যদি কারুর কাছে থাকেই। তাই আমার বড় বেশি আশা ছিল যে আমরা দুজনে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এ জীবনের শ্রান্তি-ভারকে লাঘব করব, পাথেয়কে সমৃদ্ধ করব, পথচলার অন্ধকারকে আলোকিত করব। কিন্তু—সম্প্রতি আমার কি জানি কেন কেবলই মনে হয় যে অজ্ঞাতসারে আমরা দুজনেই ফের একটা চোরাগলিতে ঢুকেছি—অপ্রাপ্য ধনের ব্যর্থ আশে।"

স্বপন তার মুঠোর মধ্যে আনার হাতের চাপ অনুভব করে। আনার গাল তার বাহুতে ঠেকে। স্বপনের কোথায় একটা তার বেজে ওঠে যেন। সুর একটু নীচু ক'রে প'ড়ে চলে:

"কী চোরাগলি?—প্রশ্ন জাগ্‌ছে হয়ত তোমার মনে? বোঝানো কঠিন। কারণ এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম নিরাশার কথা। তার মানে অবশ্য এ নয় যে নিরাশাটা একটুও ছায়াময়। মানে এই যে তৃষ্ণার্ত্ত যখন তৃষ্ণার জল ব'লে সুরার কাছে হাত পাতে তখন হয়ত তার তৃষ্ণা একটু উপশম হয়, কিন্তু জলের কাছে সে যে শ্রান্তি-নাশিনী তৃপ্তি পেতে পারত সুরার কাছে তার আশা করতেই পারে না। আমি ইসার সংস্পর্শে আনন্দ পাই—খুবই পাই—কিন্তু সময়ে সময়ে কি জানি কেন মনে হয় যে আমার প্রকৃতির মানুষের কাছে ওর ভালোবাসা বুঝি তৃষ্ণার জল নয়—রঙীন সুরারই মতন একটা কিছু—যার মধ্যে আছে নেশা, আছে স্ফূর্ত্তি, আছে ক্ষণিক আবেশ। কিন্তু নেই স্বচ্ছতোয়া কল্লোল, তৃষ্ণাহরণী উপশান্তি, আকাশের নীল নীড়।

"কিন্তু কেন নেই? আর শুধু কি ওর মধ্যেই এর অভাব—না সব নারীর মধ্যেই? থেকে থেকে ভেবে এত বেদনা পাই—অথচ কূল পাই কই? তবে আজকাল যেন একটু আভাষ পাই সময়ে সময়ে—পুঞ্জ মেঘের অন্তরালে চাপা বিদ্যুদ্দামের ঝলকের মতন। কিন্তু ঐ বিদ্যুতের মতনই সে পলাতকা। ধরতে না ধরতে যায় মিলিয়ে। তা যাক্—তবু তো একটু কম ঝাপ্‌সা দেখি এই বেদনার অঞ্জন প'রে—এই-ই আমার বর্ত্তমানের সান্ত্বনা। চোখ তবু একটুও তো খুল্‌ল এ-আশাভঙ্গে। যথালাভ।

"কিন্তু এ আক্ষেপ যাক্। আভাষ পাওয়ার কথা বল্‌ছিলাম না? কী আভাষ পাই শুন্‌বে? ইসাকে বোলো না কিন্তু। ও বড় ব্যথা পাবে। ও জানে না আমার মধ্যে কত দ্বন্দ্ব চ'লেছে!···

"আমার মনে হয়: আমরা প্রেমের ক্ষেত্রে যার পিছনে ছুটি তা অত্যন্ত স্পষ্ট একটা কিছু।—বল্‌বে মরীচিকা? কিন্তু মনে রেখো মরীচিকালুব্ধ ভ্রান্ত হ'তে পারে—জল ব'লে জলাকৃতি ছায়ার পিছনে ছুটতে পারে—কিন্তু চায় সে জলই, ছায়া নয়। কাজেই মরীচিকা ছায়া হ'লেও, যার ভরসা ও দেয় সে ছায়া নয়। ঠিক্ তেমনি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও। ভালোবাসার আমরা চিরভিখারী, কেননা আমরা জানি যে এক ভালোবাসাতেই তৃষ্ণার জল মিল্‌তে পারে। কিন্তু বাঞ্ছিত সার্থকতা-সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'লেও কেন জানি না নানান্ ফেরে প'ড়ে ছোটাছুটি করি ঐ দেহগত প্রত্যাশাকেই প্রদক্ষিণ ক'রে। বার বার এ-পরিক্রমায় নিরাশ হই, তবু বুঝেও বুঝি না যে দেবতা তীর্থেও নেই পরিক্রমায়ও না। দেহতৃষ্ণা হচ্ছে দেবছদ্মবেশী অপদেব, প্রত্যাশা—স্ফূরৎ-বিভা আলেয়া, কামনা—সরোবরবেশী মরীচিকা। ওদের স্বধর্ম্ম—ডাকা—প্রতিশ্রুতির রঙীন উৎকোচে প্রলুব্ধ করা। রঙীন বল্‌ছি এই জন্যে যে এসবের নানান্ অঙ্গীকারের মধ্যে আছে একধরণের নাটারঙ্গের শিহরণ, একধরণের চকিত হিল্লোল—আস্বাদন-ভরা। এতে একরকমের সার্থকতা হয়ত থাকতেও পারে—অন্ততঃ আছে মনে করা অসঙ্গত নয়—নইলে সেই তৃষ্ণার এই লোলুপতা নিয়ে এত মারামারি কেন? মরীচিকার কাছে জল না থাকুক—মোহ আছে বই কি, নইলে লোকে ছোটে কেন? একথা তো খুবই স্পষ্ট।

"কিন্তু তাব'লে এর মধ্যে নেই সেই ভালোবাসা—যার জন্যে

মানুষের হৃদয় চির বৈরাগী—চির-বুভুক্ষু। সেই ভালোবাসা—যা ওঠা-পড়ার উপর নির্ভর করে না—যা নিত্য-নূতন ইন্ধনের নিত্যস্ফুরৎ রক্তরাগের মুখাপেক্ষী নয়। কেন এধরণের কথা বলছি শোনো, যেজন্যে মনটা আমার ভারাক্রান্ত আছে কাল থেকে। নইলে এ চিঠি লিখ্‌তাম না হয়ত। আশ্চর্য্য! সময়ে সময়ে আমার মনে হয় বুঝি মানুষ শুধু একরাশি আশা আকাঙ্ক্ষা হর্ষ বিষাদের জটলা! নইলে কালকের কয়েকমিনিটব্যাপী একটা ঘটনার জন্যে আমার মনের রঙ এত বদ্‌লে গেল কেন? পরশুই তো কী রকম উল্লাসের মধ্যে কেটেছে—এক পিকনিকে! আর আজ! মনে হয় কেবলি গেটের গভীর অবসাদ!"

'Alles, was wir treiben and thun, ist ein Abmuden; wohl dem, der nicht mude wird.'

সকল কর্ম্ম সকল মর্ম্ম হিয়াকূলে বহি' শ্রান্তি আনে
ভাগ্যবান্ সে—জীবন বেলায় শ্রান্তি-অন্ত যে নাহি জানে!

"যাক্ বলি ব্যাপারটা:

"লণ্ডনে আমরা প্রথমে উঠেছিলাম ইষ্ট এণ্ডে জানোই তো। একটা ফ্ল্যাটে আমি ওমো উয়েদা ও ইসা একত্রেই ছিলাম।

"কিন্তু সে মলিন পাড়ায় থাক্‌তে ওর বড় কষ্ট হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে মোটা টাকাটা এসে গেল। আমার হ্যাম্পষ্টেডে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিলাম—হীথের সাম্‌নেই।

"পাঁচ ছ'দিন ভারি আনন্দের কৌমুদীয়ানে হু হু ক'রে কাট্‌ল। তার পরই এলো রাহু।—আমাদের নীচের ফ্ল্যাটে ছিল বার্টন ব'লে একটি মস্ত খেলোয়াড়। আমার ছবি দেখে সে ভারি খুসি। ভাব হ'য়ে গেল।

"বয়স তার হবে বছর আটাশ। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ—স্পোর্টস্‌ম্যান যাকে বলে। গত বছর ক্রিকেটে ও টেনিসে কেম্‌ব্রিজ থেকে ব্লু পেয়ে এসেই উইম্বল্‌ডনে সেমি ফাইন্যালে কে একটি বিখ্যাত ফরাসী খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যায়। কিন্তু তাকে আর একটু হ'লেই হারিয়ে দিয়েছিল।

"এবছর সে উঠে প'ড়ে—প্র্যাক্‌টিস করছে প্রাণপণে। বলে এবার তাকে অন্ততঃ ফাইনাল পর্য্যন্ত যেতেই হবে।

"ইসা টেনিস খেলে খুব ভালো। বার্টন তাকে নিমন্ত্রণ করল ওদের ক্লাবে। ইসা যেতে সুরু করল, এবং দু' দিনেই 'cynosure of neighbouring eyes' হ'য়ে উঠ্‌ল—বুঝতেই পারছ। ইংলণ্ডে একেই সত্যিকারের 'ব্রুনেত্' সুন্দরী নেই—তার উপর সাক্ষাৎ ইসাবেলা। নিমন্ত্রণের অশ্রান্ত আবর্ত্তে প'ড়ে গেল ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে।

"ওর খাতিরে আমারও পসার হ'ল বই কি একটু। বার্টন কত যায়গায় যে নিয়ে যেতে সুরু করল আমাকে আমার ছবি-সমেত!···

"কিন্তু দিন সাত আটের মধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম একটা জিনিষ: যে, বার্টন ও তার বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করে যেন একটু দায়ে প'ড়েই। আমি তৎক্ষণাৎ ইসাকে বল্‌লাম: 'আমার দু'একটা ছবি-আঁকা প'ড়েছে, তুমি এখন থেকে পার্টি-টার্টিতে একলাই যেয়ো।'

"ভেবেছিলাম ইসা আপত্তি করবে। কিন্তু করল না। বরং একটু যেন খুসিই হ'ল। ওকে দোষ দেই না। জানো তো ইংলণ্ড ফ্রান্স নয়। এখানে অমন nymph-এর এরকম পীতাভ satyr প্রণয়ী—বড় কেউ ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর আমি খুব মিশুকও নই। এখানেও দেখ না ওর সঙ্গে আমার কী ভয়ঙ্কর তফাৎ! পার্টি-টার্টিতে ওঁর রূপের ঝরণা উচ্ছল হ'য়ে বয়—কথার হাসির ঠমকের স্রোতস্বিনী গান গেয়ে চলে। ও যেন ফুলের মতনই ফুটে ওঠে সার্ল-র রং মশালে। আর আমি হ'য়ে যাই আড়ষ্ট—খুঁজি আওতা অন্তরালের আশ্রয়। যাক্।

"দিন কয়েকের মধ্যেই দেখ্‌লাম ইসার রূপ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—ওর এখনকার প্রসাধন লোল সান্ধ্য-নৃত্যবেশা চেহারা দেখ্‌লে তুমি মাথা ঠিক্ রাখ্‌তে পারবে না—কী নৌকোয়, কী ডাঙায়।" স্বপনের সুর মৃদু হ'য়ে আসে এখানটায়।

আনা স্বপনের পানে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বলে: "কিন্তু এখানে বেচারী একটু ভুল ক'রে বসেছে। তবে ডাঙায় তুমি যে একটু আলাদা মনিষ্যি তা চাং জান্‌বে কেমন ক'রে, না?"

স্বপন ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে "দূর্"—ব'লেই প'ড়ে চল্‌ল:

"কিন্তু যে যাই হোক্—আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনির্ণেয় দুঃখ বাজ্‌তে সুরু ক'রে দিল। ইসাকে এক রাতে ছাড়া আর পাওয়াই দায়। তাছাড়া আমিও ওকে ধ'রে রাখ্‌তে চাই নে—বেচারী আমার জন্যে কম তো ছাড়ে নি। শুধু ওর নয়—ছেলেদের জন্যে মেয়েদের ত্যাগের কথা ভাব্‌লে আমার সম্ভ্রম আসে—সত্যিই। আমরা দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিজেদের চার আনা মাত্র দিই—ওরা দেয় বার আনা।—কিন্তু তবু মানুষের বাসনা এম্‌নি যে আঁকড়ে ধরতে একবার পারলে তার মুঠো আল্‌গা হওয়া হ'য়ে ওঠে দুর্ঘট। তার উপর আমি পুরুষমানুষ। ভালোবাসতে হ'লে একটু রক্ষণাবেক্ষণের ভার, কর্ত্তৃত্বের আত্মপ্রসাদ আমার কাছে শুধু বিলাস নয়—নেসেসিটি—যদিও বিদগ্ধ সমাজে একথা প্রাণপণে অস্বীকার করব।"

আনা হেসে বল্‌ল: "লেখে বড় ভালো।"

—"হ্যাঁ—এসবের বেলা ভালো তো বটেই।"

—"কিন্তু সত্যি বলে নি? বুকে হাত দিয়ে বলো তো। তোমার এত কাছে আমাকে আস্‌তে দিতে—যদি না আমি একটু অসহায় হ'য়ে পড়তাম?

"অসহায়" কথাটা আনা এমন মিশ্র সুরে বলে!··· স্বপন হেসে উড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু ভিতরটা তার হ'য়ে ওঠে আর্দ্র। সে তার কটি বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে আনে। আনার দেহ অবনমিত হয়ে এত বিশ্রব্ধভাবে সাড়া দেয়!··· স্বপনের হঠাৎ বুকের মধ্যে কোথায় দুলে ওঠে—সে তার আশ্লেষ একটু আল্‌গা ক'রে দেয়—যেন একটু সন্ত্রস্তভাবেই।

"কিন্তু স্বপন, মানুষের কাছে কোনো কিছু নেসেসিটি হবামাত্র সে তাতে বঞ্চিত হয়,—অন্ততঃ আমার নিজের ক্ষেত্রে এ যে আমি কতবার দেখেছি! তুমি দেখ নি? বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর দানের এম্‌নিই একটা বিদ্রূপী ভঙ্গী আছে—না?—যে, যে যা চাইবে তা কেবল ততক্ষণ অবধি পাবে যতক্ষণ অবধি পাওয়ার কামনা দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু যেই উঠ্‌বে অমনি আয়ত্ত যাবে ফস্‌কে—মুঠোর মধ্যেকার জলেরই মতন।—যতই আঁকড়ে ধরবে ততই তাড়াতাড়ি করতলগত হ'য়ে পড়বে অলভ্য। তখন সে কী করবে?—না, না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে, কবিত্বের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে পাওয়ার স্বাদ সংগ্রহ করবে—রচনা করবে—সৃষ্টি করবে—শিল্প দিয়ে হোক্, সত্য দিয়ে হোক্, স্বপ্ন দিয়ে হোক্, মৌতাত দিয়ে হোক্। কিন্তু মজা এই যে এজগতের উপাদান মালমশলা সব ছায়াময় হ'লেও এজগতে বাসিন্দারা অত্যন্ত বাস্তব—কংক্রীট। তাদের নাম—বঞ্চিত শিল্পী। এইজন্যেই বুঝি দার্শনিক হেসে ব'লেছেন রোমে যেমন একটা statue-র জগত আছে তেম্‌নি মানুষেরও একটা মায়াময় জগত আছে—কল্পনার। যাক্। যা বল্‌ছিলাম।

"ইসাবেলার মধ্যেও দেখ্‌লাম একটা দ্বন্দ্বের জোয়ার ভাঁটা খেল্‌ছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলে না। এতেও আমাকে বাজ্‌ল। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেখার ভঙ্গী কত তফাৎ দেখ। ও বলে: প্রতি মানুষের মধ্যে একটা প্রাইভেট জগত থাকা দরকার—বলে: আড়ালেরও দরকার প্রেমকে নিবিড় করতে।"

আনা বল্‌ল: "ইসাবেলার একথা কিন্তু সত্য নয়। তোমার মনে হয় না স্বপন?"

স্বপন এ-প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করে; তাড়াতাড়ি পড়তে লাগ্‌ল:

"আমি বলি প্রেমের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় তাগিদ প্রেমাস্পদকে গোপন কথা বলা—যা অপরকে বলা যায় না তা তার কাছে ব'লে যে-তৃপ্তি তাতেই যে প্রেমের একটা মস্ত খোরাক।"

আনা মৃদু স্বরে বল্‌ল: "এই-ই হচ্ছে সত্যি কথা।"

স্বপন সেইভাবেই প'ড়ে চলে: "কিন্তু এ ক্ষেত্রেও—যাক্ গে। আর এ নিয়ে এত বেশি লিখিই বা কেন? বোধ হয় প্রেমাস্পদও যে আসলে আমাদের কত অচেনা এটা বিশ্লেষণ ক'রে জানার মধ্যে একটা বিস্ময়ের তৃপ্তি আছে ব'লে, না? আর সে-বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনার দোলা আছে ব'লেও,—না? যাক্ শোনো অঙ্কটার শেষ গর্ভাঙ্ক।

"বুঝলাম ও চায় আমি ওর 'পরে একটু জোর করি—ওকে বলি পার্টি-টার্টিতে যাওয়া একটু কমাতে। মেয়েরা প্রণয়ীর অধিকার-জাহির করাটা সত্যিই চায়—জানো তো?

যারা বড় বেশি স্বাধীনতার জয়গান করে তারা প্রেমের এই স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতার বিষয় কিছুই জানে না স্বপন। য়ুরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার এই একটা ভারি অসার দিক্ আছে। একথা সত্যি যে বাইরের চাপে আসে দাসত্ব। কিন্তু স্বেচ্ছার দাসত্ব তো দাসত্ব নয়—তাই যে মুক্তি।—কোনো আদর্শের জন্যে দারিদ্র্য যেমন। বন্ধন? বন্ধন যখন প্রভু হয় তখনই তা হয় বিষ—যখন তাকে ভৃত্য বাঁহাল করতে পারি যে তখন সে বন্ধুর চেয়েও বন্ধু। আর বন্ধন মানে কী বলো তো। ভেবে দেখ্‌তে গেলে রেখা ছন্দ সুর সবই তো তাই স্বপন, নয়? কিন্তু সেই জন্যেই তো শিল্পের বন্ধন শিল্পীর কণ্ঠে মলয়মাল্যের মতন শোভা পায়। কিন্তু বন্ধনকে বৈধয়ন্ত্রীর করবার জন্যে চাই স্বেচ্ছা-বরণ। বাইরের চাপে যে-রিক্ততা তাতে গৌরব নেই—কিন্তু স্বেচ্ছায় যে প্লাসাদ-ছেড়ে গাছ-তলায় দাঁড়ায় তার মধ্যে প্রবুদ্ধ বুদ্ধ না হোক্ সুপ্ত বুদ্ধ কোনো না কোনো বেশে লুকিয়ে আছেন জান্‌বে।

"একথা আমি বুঝি। কিন্তু আমারও যে আবার গোঁ ব'লে এক বিষম রোগ আছে, জানো তো? যে-মুহূর্ত্তে দেখ্‌লাম ও বাইরের সাহচর্য্যে খুসি আছে, সে-মুহূর্ত্তে আমার গোঁ চাপ্‌ল ওকে একেবারেই দেব ছেড়ে। একটুও দাবী করব না। ও বুঝল—এ অভিমান। কিন্তু অভিমান বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ ভাই। সারল্যের মতনই সংক্রামক ও লোভনীয়—অথচ সারল্যে যে-কালোমেঘ কাটে—অভিমানের কাজ তাকেই ফের জড়ো করা। আমাদের মধ্যেও নানা খুঁটি-নাটিতে, নানা ছোট খাটো প্রত্যাশার অপূরণে, নানা অভিমানের দমকা হাওয়ায় একটু একটু ক'রে অনেকখানি ছায়ান্ধকার পুঞ্জীভূত হ'য়ে এলো। এক এক সময়ে ইচ্ছা হ'ত একটা খোলাখুলি কথাবার্ত্তার হাওয়ায় সব কুয়াশাকে দিই দূর ক'রে, কিন্তু আঁধি যখন ওড়ে, তখন স্পষ্টিকস্বচ্ছতাও যে হ'য়ে আসে সিক্ত কাচের মতন ঝাপ্‌সা ভাই, সহজ হওয়াই যে হ'য়ে ওঠে সব চেয়ে শক্ত! নানা সঞ্চিত অনির্দ্দেশ্য বেদনার ফলে ইসাবেলার আড়াল-কামনার কথাও উগ্রভাবেই মনে হ'তে লাগ্‌ল;—মন বল্‌ল, যখন আড়ালই ও চায়—তখন কেনই বা এক-তরফা ঘনিষ্ঠতার ভিক্ষা, অকপট খোলাখুলি কথাবার্ত্তার জন্যে হাংলামি?

আপনাদের পছন্দ ও ডিজাইন অনুযায়ী
সকল রকমের স্বদেশী রেশমে প্রস্তুত
শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ও প্রিয়জনের
উপহার উপযোগী
বেনারসী সারী ও জ্যাকেট
একমাত্র আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি
এবং আধুনিক রংয়ের ও নানা ফ্যাসানের
তসর, গরদ, মট্‌কা, খদ্দর ও সিল্কের চাদর
প্রভৃতি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।
ভূদেব উইভিং ফ্যাক্টরী
সো-রুম:— গোধুলিয়া বেনারস সিটি।

তারা ক'য়ে যায়

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

তারা ক'য়ে যায় বার বার :
এ বিশাল পৃথিবী আমার
কদর্য্য কামনা-পঙ্কে চির-নিমজ্জিতা
বক্ষে তার জ্বলে নিত্য ব্যর্থতার সুসজ্জিত চিতা,
বাসনার মরুভূমে মরীচিকা মায়া
আঁধার কুহেলি-ঘন স্বপনের ছায়া!

তারা ক'য়ে যায় :
নিশীথের যবনিকা ছিন্ন করি' সোনালী উষায়
যে-আরতি-গুঞ্জ জাগে প্রাণ-কুঞ্জ-মাঝে
তাহে সাজে
দুর্ব্বিষহ জীবনের দীপ্রদাহী বেদনা-দানবী
ঝঞ্ঝার ভৈরবী!

তারা ক'য়ে যায় :
সন্ধ্যার সজ্জায়
যে-রক্তিম আবেশের উৎসধারা ছুটে
গগনের হৃদয় সম্পুটে,
সে শুধু পাণ্ডুর শূন্যে দিবসের মৃত্যু-সমারোহ
ক্ষণিকের মোহ।

তারা ক'য়ে যায় :
বসন্তের নৃত্য-ছন্দে শাখায় শাখায়
নন্দনের পুণ্য-গন্ধী যে প্রদীপ্তি ভায়,
সুরভি-সুষমা-ময় বরণের বিচিত্র সভায়

পিক-কণ্ঠ-রাগে
যে-ঝঙ্কার জাগে—
মানবের চেতনায়
নহে নহে নহে সত্য হায় !

তারা যে জানেনা কভু শ্যামা মোর পৃথিবী জননী
সীমাহীন শুভ্র-পূত সৌন্দর্য্যের পীযূষের খনি
রাখিয়াছে সঙ্গোপনে আপনার প্রচ্ছন্ন অন্তরে ;
নিত্য তাহা ঝরে
প্রস্ফুট কমল-কীর্ণ জীবনের মহাসরোবরে !
নহে নহে এ জগত বিভীষিকাময়
অপ্রেম আলয় !
আমি জানি, আমার অখণ্ড হিয়া
দিকে দিকে আপনারে দেছে প্রসারিয়া,
আমি জানি, এই ফুল এই ফল
এই মোর জল স্থল
আমারি আত্মার সত্য রয়েছে বিধৃত
নিখিল-বীণার সুরে বাজে মোর বীণার সঙ্গীত !

"আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী—"

গল্প

শ্রীশৈলজা সেনগুপ্তা

সকালের ডাক আসিয়া পৌঁছিতেই অপর্ণা আগ্রহ-চঞ্চল হাতে একখানা চিঠি বাছিয়া আগে তুলিয়া লইল···বেশ ভারী খাম খানা ! পূজার ছুটিতে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়া মাধবী লিখিয়াছে, বন্ধুকে।···প্রতিছত্রে তার উচ্ছল আনন্দের মুক্তধারা যেন নাচিয়া, বহিয়া চলিয়াছে···এখানে, ওখানে, দেশ, বিদেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের বাছা বাছা কবিতার দু'চার লাইন করিয়া 'কোট' করা। দূর হইতে যতখানি সম্ভব, সমুদ্রকে চিঠির পৃষ্ঠায় ভরিয়া, বন্ধুর কাছে পাঠাইবার ব্যাকুল চেষ্টায় উচ্ছ্বাস ও কবিত্বে দীর্ঘ সাতপাতা নীরেট ভাবে ভরাট করিয়া উপসংহারে মাধবী লিখিয়াছে—"ভোগের চরম তৃপ্তি হয় সেইখানে,—যেখানে দেহ ও মনের নিঃশেষ মিলন ঘটে। এক-কে বাদ দিয়ে অপরের পাওয়া—অসম্পূর্ণ। ...বেশীদিন তার মাদকতা থাকে না। শীগ্‌গিরই একটা ক্লান্তি এসে পড়ে। সৌন্দর্য্যের শাশ্বসম্মত মাপকাঠি দিয়ে হিসের গতিয়ে দেখলে, পাহাড় আর সমুদ্রের মধ্যে কার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে···কিন্তু যদি আঁখি ও মনের অনুভবের সঙ্গে দেহ দিয়েও 'পরশ' পেতে চাও···তবে সমুদ্রে এসো। এর স্নিগ্ধ নীলিমা তোমার চোখ জুড়িয়ে দেবে,—বিরাট সৌন্দর্য্যে মন ভরে যাবে, আর সেই সঙ্গে ঢেউয়ের পর ঢেউ, নীলজলে শাদা ফেনা তুলে—সহস্র শীর্ষ সাপের মত ফণা উঁচিয়ে ছুটে এসে তোমার পায়ে আছড়ে পড়বে...তোমাকে কামনা করে অশান্ত উচ্ছ্বাসে অধীর চঞ্চল সমুদ্র ছরন্ত আবেগে ছুটে আসবে,—তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ! স্কুলে পড়া ভূগোলের বিদ্যা ভুলে যাও···এর প্রাণ আছে··· ভাষা আছে ! এর ভাষা নীরব নয়···মুখের। কিন্তু বুঝবার মত দরদ থাকা চাই ! একবার এখানে এস··· এ তোমাকে কি বলতে চায়, শুনে যাও···কদিনের জন্যও অন্ততঃ এস—

অপর্ণার দৃষ্টি চিঠির পাতা হইতে উঠিয়া খোলা জানালা-পথে ভাসিয়া চলিল—সমুদ্র ! সীমাহীন বিরাট নীলিমা ···ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, নামিতেছে,···কি যেন চাহিয়া না পাওয়ার ক্ষুব্ধ আক্ষেপে ছুটিয়া আসিয়া বেলা-ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছে !

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে সে একবার পুরী গিয়াছিল—সমুদ্রের ভাসা-ভাসা ছায়ারূপ, এখনও অস্পষ্ট মনে পড়ে। সত্যিই কি এর শেষ নাই ?

দূরে,—দূ-রে, আরো-ও দূ-রে, অনে—ক দূরে যদি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কেহ একখানি নৌকা করিয়া চলিয়া যায়,···একদিন—ভোরের অস্ফুট আলোর ছোট্ট নৌকাখানি তার নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ করিয়া কোথাও এক অজানা কূলে কি ভিড়িবেনা ?

নাই বা ভিড়িল ! বিশাল ! বিপুল জলের বুকে, ঢেউয়ের তালে-তালে, একবার উঠিয়া, একবার নামিয়া— মোচার খোলার মত ছোট্ট একখানি জেলে ডিঙ্গিতে উদ্দেশ্য-হীন অলসভাবে ভাসিয়া যাওয়া—সেই বা মন্দ কি ! কিন্তু একলা নয় ! এমন একজনকে সেই ছোট্ট নৌকায় জায়গা দিতে হইবে যার চোখের নীরব দৃষ্টি সহস্র অকথিত বাণীকে রূপ দিবে—মুখর কণ্ঠ চারিদিক ঘেরা অশ্রান্ত জল-কল্লোলের মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া যাহা বলিতে চায়, তাহার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া মূক হইয়া রহিবে···নৌকার গায়ে জলের যে ছল-ছল সুর বাজিবে—তাহারই সঙ্গে নিজের হারাইয়া যাওয়া ভাষার সুরকে মিশাইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিবে !

অপর্ণা ভাসিয়া চলিয়াছে···কিন্তু তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রার সাথী—ও কে ? কাহার মুগ্ধ নয়নের স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টি এক ঝলক জ্যোৎস্নার মত তাহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছে ? পৌরুষ কঠিন বলিষ্ঠ একখানি হাত আলতো

ভাবে তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িল···সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—এমনি বাহুর আশ্রয়ে নিজেকে—! অপর্ণার মুখ রাঙিয়া উঠিল···মধুর পুলকের আবেশে সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

"—বউ মা—"

চমকিয়া অপর্ণা পিছন ফিরিল, উৎকণ্ঠিত স্নেহে শাশুড়ী কহিলেন "কার চিঠি, বৌমা—? বেয়ানের? ভাল আছেন ত সব?—"

চাপা একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া অপর্ণা উত্তর দিল "মাধুর চিঠি, মা! ওরা, ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে গিয়েছে—সবাইকে—তাই লিখেছে···আমাকে যেতে! অনেক করে লিখেছে—যাতে একবার যাই।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ়া কহিলেন "তাই ভাল! অনেক-ক ক্ষণ ধরে চিঠি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ··· ভয় হোল—কি 'খবর' এল কে জানে!" একটু থামিয়া কহিলেন "মাধবীর দাদাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে গেছে, না? আহা!" অমন ছেলে···কি হয়ে গেল! এ কি 'অত্যেচার,' মা! ভাল ভাল ছেলে গুলোকে বেছে-বেছে নিয়ে—একেবারে নষ্ট করে ছেড়ে দেওয়া! তাই বা ছাড়ে কই! তোমার সাধ ত এখনও জেলে পচছে! কবে যে এর শেষ হবে! ভাবতেও পারিনে! কার যে কখন কি 'সব্বনাশ' হবে—ভয়ে বাঁচিনা!" বধূকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিলেন "তা আর ভেবে কি করবে, বউমা! ওরা হচ্ছে বড়লোক···যখন যেখানে খুসী যাচ্ছে···যা খুসী করছে! আমাদের কি তাই দেখলে চলে? আমাদের মত লোকে কি আর বেড়াবে বলে বেড়াতে যেতে পারে—. নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে? সেবার ভুলুকে নিয়ে মধুপুরে হাওয়া বদলাতে গিয়ে—কি টাকার ঘন্টটাই না হোল! সব বরাত, মা, সব বরাত।"

অপর্ণা উত্তর দিল না···নীরবে দাঁড়াইয়া আন মনে চিঠি-খানা বার-বার খুলিয়া ভাঁজ করিতে লাগিল।···চিঠির যেখানে-যেখানে মাধবী ব্যরবার তাহাকে যাইতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছে; তাহার পাশে-পাশেই, সে যেন, বহুদিন পূর্ব্বের দেখা একজোড়া প্রতিভা উজ্জ্বল চোখের ভাবে-ভরা গভীর দৃষ্টির করুণ মিনতি অদৃশ্য অক্ষরে স্পষ্ট লেখা দেখিতে পাইল···দু-রে' ঘন কুয়াসার ওপারে, সে চোখ যেন তাহারই পানে চাহিয়া আছে—দূর আকাশের তারার মতই স্থির, উজ্জ্বল দীপ্তিতে! ···কি বলিতে চায় সে চাহনি?···চোখের ভাষা এত স্পষ্ট?···এত স্বচ্ছ প্রকাশিত? ··কিন্তু—কিন্তু—!

"চা' থাওয়া হয়ে গেলে একবার—"

অপ্রস্তুত ভাবে অপর্ণা বারন্দার ছোট টেবিলের উপর হইতে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল,···শাশুড়ী কহিলেন "আ আমার কপাল! কখন দিয়ে গেছে···এতক্ষণে ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে! একটু গরম করে দিক না! ওরে—অ"—

তাড়াতাড়ি পেয়ালাতে চুমুক দিয়া অপর্ণা বলিয়া উঠিল "গরম করবার দরকার নাই, মা, ঠাণ্ডা হয় নি—"গরম করিবার যে কিছুমাত্র দরকার নাই, তাহা জানাইবার জন্য সে এক নিঃশ্বাসে চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া ফেলিল। শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন—"পাগল!"

গামছা, গঙ্গাজলের ঘটি ও কাচা কাপড় হাতে শাশুড়ী বাহির হইয়া গেলেন, বধূ সংসারের নিত্য নিয়মিত অসংখ্য খুঁটিনাটির স্রোতে নিজেকে ছাড়িয়া দিল—নষ্ট ফরার মত সময় এখন হাতে নাই!

বেশী আগে দিয়া ঝোলের বড়ি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না ফেলে, সে বিষয়ে ঠাকুরকে যথেষ্ট সতর্ক করিয়া পরে ও ফোড়ন-সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতা যে রন্ধন-শাস্ত্রে একান্ত অন্যায় ও নীতি-বিগর্হিত, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র—এমন সময়ে সদর দরজায় সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অপর্ণাও ছুটিয়া আসিল··· গৃহিণীপণার সমস্ত খানি দায়িত্ব রান্নাঘরে ঠাকুরের জিম্মায় পড়িয়া রহিল!

বন্যার সাহায্যের জন্য গান গাহিয়া ছেলের দল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল···গানের ছত্রে-ছত্রে অভাবের আর্ত্তনাদ, একমুষ্টি অন্ন ও পরণের একটুকরা ন্যাকড়ার জন্য করুণ আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে···অপর্ণার চোখ সজল হইয়া আসিল। ভাঁড়ার হইতে চাল্, বাক্স হইতে নিজের ও

ছেলেমেয়ের পুরানো কাপড় জামা ও দুইটি টাকা আনিয়া প্রসারিত অঞ্চলিতে ফেলিয়া দিতে গিয়া সে যেন একটা ধাক্কা খাইয়া পিছনে হটিয়া আসিল! এত কম! অঞ্জলি যে কিছুই ভরে নাই! তাহারই না হয় ক্ষমতায় কুলায় না—কিন্তু ভরিয়া দেওয়ার ক্ষমতা যাহাদের আছে, তাহাদের সংখ্যাও ত নেহাৎ কম নয়! ঐ মোটা-মোটা থামওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী—তিন খানা দামী মোটরের মালিক—সে ইচ্ছা করিলে এ অঞ্জলির অনেক খানিই যে ভরিয়া দিতে পারিত! সামান্য—অতিতুচ্ছ—বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির বেলায় যাহাদের এতটুকু হিসাব-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না···ক্ষুধার্ত্ত দেশের লোকের মুখে একমুষ্টি অন্নের বেলায় তাহাদেরই এতখানি বৈষয়িক বিবেচনা? অপর্ণার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। দেশের রাজক্ষমতা যদি এক দিনের জন্য—এক বেলার জন্যও—তাহার হাতে আসিত! সে একবার দেখিয়া নিত···একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিত এদের! ওঃ! একবার যদি সে কয়েক ঘন্টার জন্যও অন্ততঃ আবুহোসেনের মত রাজতক্তে বসিতে পাইত! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মন আইন, আদালত, থানা, পুলিশ, জেল, কয়েদ, ফাঁসীমঞ্চ, সব খুঁরিয়া আসিল···নিষ্ফল ক্রোধে অন্তর বারবীর ফুঁসিয়া উঠিতে লাগিল!

বাক্স খুলিয়া আর একটা টাকা ও আর কিছু চাল, ভিক্ষার ঝুলিতে ঢালিয়া দিয়া সে সদর ও অন্দরের মাঝে ছোট ঘরটিতে স্বামীর সন্ধানে গেল।

বীরেনের কলম তখন গল্পের শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে···প্রেমাস্পদের আনীত গাড়ীতে, খিড়কি দরজা দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে নায়িকা স্খলিত কবিত্ব পূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া চিঠি লিখিতেছে—

ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর তন্ময় ভাব দেখিয়া অপর্ণা প্রথমটা একটু ইতস্তত করিল, তারপর কাছে সরিয়া আসিয়া কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা" কাউন্সিলের মেম্বারারত ইচ্ছে করলে সকলে মিলে নতুন কোনও আইন করতে পারে, না?—"

নায়িকার চিঠির ভাষা ও বক্তব্যটা কি রকম হইলে অধিকতর হৃদয়স্পর্শী হইতে পারে, তাহারই চিন্তায় বীরেনের বাহ্যজ্ঞান একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—সহসা স্ত্রীর এমন বেয়াড়া প্রশ্নে চমকিত হইয়া, হতবুদ্ধির মত উত্তর করিল "নতুন আইন? সে কি? আবার কি নতুন আইন হোল—?"

তাহার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একটু রাঙিয়া উঠিয়া সঙ্কোচজড়িত মৃদুকণ্ঠে অপর্ণা কহিল "না হয়নি—হওয়ার কথা বলছি! এই ধরনা—যেমন সারদা বিল 'পাশ' হয়ে গেল! সেত দেশের লোকেরাই করলে! তেমনি যদি কোনও আইন—দেশের লোকেরা—নতুন করে সৃষ্টি করে? এই যেমন—বড়লোকেরা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা—নিজের বলে আটকে রাখতে পারবে না—"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ অপু, 'প্রয়োজন' বলে কথাটার ব্যাপকত্বের সীমানা আজ পর্য্যন্ত কেউ চিহ্ন করে 'দাগিয়ে' দিতে পারে নি! দশ টাকাতেই কখনও কারও 'প্রয়োজন' শেষ হয়ে যায়—আবার এমন অনেক আছে—যাদের দশ হাজারেও 'প্রয়োজন' কুলিয়ে ওঠে না···অভাব বেড়েই চলে!—"

বিরক্ত হইয়া অপর্ণা কহিল "তা বল্লে চলবে কেন! সত্যি করে যতটা দরকার—হিসেব করে ততটা নিতে হবে! অমন অন্যায় আবদার করলেই ত আর হয় না!—"

হা' হা' করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বীরেন কহিল, "সেটা না হয় তুমি এরপর দুপুর বেলায় হিসেব করে রেখ··· তারপর 'অ্যাসেম্‌ব্‌লিতে' মহামহিমময়ী শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—বিল পাশ করিয়ে নেওয়া যাবে! এখন আপাততঃ আমাকে গল্পটা শেষ কর্ত্তে দাও...আফিসের বেলা হ'ল।" বীরেন পরিত্যক্ত কলম উঠাইয়া লইল।

অত্যন্ত রাগ করিয়া অপর্ণা সোজা রান্না ঘরে চলিয়া গেল...ঠাকুর ততক্ষণে বড়ি ভাজিয়া যাওয়ার আশঙ্কায়, ঝোলের কড়া নামাইবার পর তাহাতে বড়ি ছাড়িয়া, সন্তর্পণে কাঁসীতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া, জিরা-ফোড়ন দিয়া সুক্তো তুলিয়া দিয়াছে।

দুপুরে

অপর্ণা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল···বৈশাখের খররোদে ক্লান্ত, হতশ্রী, পৃথিবী, শুষ্ককণ্ঠে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিয়াছে···জোর করিয়া টানিয়া আনা হাসির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের মত, দুপুরের তীব্র আলো বড় অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সেলাই করিতে বসিয়াছিল সে...কিন্তু সেলাই-কলের খট্‌খট্ শব্দ কানের কাছে এমন বেসুরো চীৎকার করিয়া উঠিল যে তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়াছে! শ্রান্ত মধ্যাহ্নের বুকে ক্ষণিক বিশ্রামের যে ক্লান্ত মৃদু সুরটি বাজিয়া চলিয়াছে—এ খট্ খট্ ঝন্ ঝন্ শব্দ তাহার সঙ্গে মিশ খায় না···এ যেন রীতিমত ছন্দপতন! সে যদি এস্রাজ—সেতার—যাহাই হউক কোনও একটা কিছু বাজাইতে জানিত—!

বাহিরের দিকে চাহিলে চোখ জ্বালা করে···এমন সময়েও কেহ ঘরের বাহির হয়! কে একজন হিন্দুস্থানী—হাঁটুর উপর কাপড় পরিয়া—লাঠির আগে একটা মলিন কাপড়ের পুঁটলী ঝুলাইয়া, একজোড়া শক্ত চামড়ার নাগরা হাতে ধীরে-ধীরে পথ চলিতেছে···অপর্ণার মন ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—কোথা হইতে আসিতেছে সে—কোথায় তাহার যাত্রা শেষ হইবে!

অপর্ণা ভাবিতে লাগিল—এমনি করিয়া পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া তখনকার দিনে লোকেরা—রেল ষ্টীমার হওয়ার অনেক আগে যখন পায়ে হাঁটার যুগ ছিল—কেমন একদেশ হইতে অন্যদেশে দল বাঁধিয়া চলিত···দল বাঁধিয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে, খোলা মাঠে, গাছের ছায়ায়, নদীর ধারে, একবেলা বা একরাতের জন্য অস্থায়ী সংসার বাঁধিত···প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেই খেলার সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার পথ চলিত! নিত্য নতুনের সঙ্গে পরিচয়—নিত্য নতুন আনন্দ—তাহাদের চলার পথকে সরস সুন্দর করিয়া রাখিত··· বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের রুটিনকরা দিনগুলিকে কোনও মতে টানিয়া নিয়া যাওয়ার অসহনীয় বিরক্তি তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিত না! তাহার নিজের জীবনের কথা মনে হইল···কী জীবন! বৈচিত্র্য নাই, বিশেষত্ব নাই, আনন্দও বোধ হয় নাই। সকাল হইতে রাত পর্য্যন্ত—পুরা একদিনের পর আর একদিন্—তারপর আর একদিন—এমনি করিয়া দিনের পর দিন গাঁথিয়া, উদ্দেশ্যহীন, সার্থকতাশূন্য গতানুগতিক ভাবে কাটাইয়া দেওয়া···আফিম-খোরের মত অসাড়, নিঃস্তরঙ্গ, ঝিমাইয়া পড়া চেতনাশক্তি··· খানিকটা রক্তমাংসের বোঝা···এরই নাম কি জীবন? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে কাঁদিয়া উঠিল—নাঃ নাঃ সে এভাবে বাঁচিবে না—বাঁচার মত বাঁচিবে···সে যে আসিয়াছিল—সে যে জন্মিয়াছিল—তাহার জীবন যে সত্যিকারের জীবন—তাহা সে নিজেকে বুঝিতে দিবে··· অপরকে বুঝাইবে! সে বাঁচিবে···পরমায়ুর গোনা-গাঁথা দিনগুলিকে টানিয়া-টানিয়া শেষ করিয়া দিয়াই তাঁহার বাঁচিয়া থাকাকে ফুরাইয়া যাইতে দিবে না...রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময়ী পৃথিবীর অপূর্ব্ববৈচিত্র্য শতদলের মর্ম্মকোষ সঞ্চিত সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান তাহাকে নিতে হইবে!···পরিচিত জগৎ হইতে নিঃশেষ মুছিয়া যাওয়া—কোনও মতেই সে সহ্য করিতে পারিবে না!

চীৎকারে পাড়া কাঁপাইয়া লাফাইতে-লাফাইতে ভুলু আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। হাতের বইগুলি সশব্দে শোবার ঘরে খাটের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া মার কাছে ছুটিয়া আসিল—"ছুটি হয়ে গেল মা! হেড স্যার, "মা, য়্যায়সা পাজী—ছুটি দিতে চায় না কিছুতেই! কিন্তু পারবে কেন লেডী ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে? কেমন জব্দ! একদম কাবু!—" ভুলুর চোখ, মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

ছেলের দুষ্টু হাসিভরা মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "আজ আবার কি হোল রে"—

সোৎসাহে মুখ হাত নাড়িয়া ভুলু কহিল "জান না? জহরলাল যে 'য়্যারেষ্ট' হয়েছে—"

অপর্ণার বুকের ভিতর 'ধ্বক্' করিয়া উঠিল—তাইত! নিমেষ মধ্যে চেনা-অচেনা, জানা-অজানা, দেখা-অদেখা —যাহাদের নামও কখনও শোনে নাই—এমন কতজন তাহার মনের পথে ভিড় করিয়া জমিতে লাগিল··ছোট ভাইটির হাস্যচঞ্চল মুখ মনে পড়িল···আর মনে পড়িল—শীর্ণ ক্লান্ত একখানি পাণ্ডুর মুখ! অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে মোচড়াইয়া উঠিল—অক্ষম সে···কত অক্ষম! সত্যিই কি তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই? কিন্তু···অজ্ঞাতেই হাত তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল।

মায়ের ভাবান্তরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া ভুলু অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—"কাল বোধ হয় 'হরতাল' মা! সব বন্ধ! ইস্কুল-ও হবে না! ক্যা মজা! রোজ-রোজ এমনি হয়।"

ঠাস্ করিয়া ছেলের গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া ঝাঁঝিয়া উঠিয়া অপর্ণা বলিল "রোজ-রোজ এমনি হলে খুব মজা হয়, না? এই বিশ্বে হচ্ছে! কি বুদ্ধি···বাঁদরের—!"

আচমকা অমন চড়টা খাইয়া ভুলু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, পাশের ঘর হইতে ঠাকুমা ছুটিয়া আসিলেন ···প্রহারের কারণ জানিয়া বধূকে তিরস্কার করিলেন— "ছেলেমানুষ—না জেনে, না বুঝে না হয় একটা কথা বলেই ফেলেছে···তাই বলে বুড়ো মাগী···অমন করে চড়টা মারা? ...কোথায় তেতেপুড়ে এসেছে! একি, মা, সব আজ-কালের? আমরাও ছেলের মা ছিলাম···কি দিন কাল গো—" বকিতে বকিতে রোরুদ্যমান নাতিকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

অপর্ণা উত্তর দিলনা· রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিতে লাগিল। নীচে রাস্তা তাতিয়া এত গরম হইয়া উঠিয়াছে—পা রাখা শক্ত···উপরে সূর্য্যের নিষ্ঠুর দাহন! এ সময়ে পথ চলা—খালি পায়ে! সে যদি অই লেডী ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে এমন বিনা কাজে, খালি মাথায়, খালি পায়ে পথে পথেও ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত!· ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে মনে হইল কাজ কিছু হোক, না হোক, খানিকটা কষ্ট ত তাহার করা হইত!

সেই হিন্দুস্থানী লোকটির কথা মনে পড়িল··আচ্ছা সে যদি তাহার মত লালটুকটুকে ভেলভেটের বার্ম্মিজ শ্লিপার জোড়া হাতে ঝুলাইয়া, খালি পায়ে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হয়? কথাটা মনে পড়িতেই হাসি পাইল...আপনার মনেই হাসিয়া মুখ ফিরাইতে নজর পড়িল—মোটা-মোটা থামওয়ালা বড় বাড়ীর বারান্দায়···কে একজন দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকেই দেখিতেছে! কী অদ্ভুত চাহনি···! ঘৃণায় অপর্ণার ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল···তীব্র দৃষ্টিতে একবার লোকটার প্রতি চাহিয়া সরিয়া আসিল।

একলা পাইয়াই না লোকটা তাহার দিকে অমনভাবে চাহিতে সাহস করিয়াছে! থাকিত এখন তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে—! কিন্তু···অনাবৃত প্রায় আপনার হাত-খানিকে বার কতক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া চিন্তিতভাবে অপর্ণা মাথা নাড়িল···নিপুণ প্রসাধিত সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার সঙ্গে মেয়েরা শক্তি চর্চ্চার দিকেও যদি একটু নজর দিত! সেই না হয় ঘরে থাকে...বাহিরেও ত কত জনকে কত কাজে বাহির হইতে হয়! অপর্ণা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।··· নিমেষ মধ্যেই ম্লানিমার কালো ছায়ায় মুখের উজ্জ্বলতা নিভিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠিল —বেদনার করুণ ছাপ! কত-ই তাহার করিতে ইচ্ছা হয়! দিনের মধ্যে কতবার, ক-ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচিত্র অনুভূতির দোলায় মন তাহার চঞ্চল হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে···সকলের অগোচরে অন্তরের গোপনতম কল্প-লোকের খেলাঘরে ক-ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে তাহার নতুন নতুন সৃষ্টি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্যের মহিমায় ঝলমল করিয়া অপরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে—একটু পরেই বাস্তবের কঠোর নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খেলাঘরের ধূলার মতই কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে! কী প্রচণ্ড ক্ষুধা তাহার অন্তরের—! সৃষ্টির সমস্ত রসকে নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়া নিতে চায়! অথচ ক্ষমতা তাহার কিছুই নাই! আনমনে সে বাহিরের রৌদ্রোজ্জ্বল গাঢ়নীল আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল···সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটি নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল!

সেলাইর কলে খট্‌খট্ শব্দ বাজিল···বালিশের ওয়াড় কয়টা শেষ করা আজ নেহাৎ দরকার···বিকালে ধোবা আসিবে।

রাতের আঁধারে

দিনের কলরব অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে...সংসারের সারাদিনের পাওনা সংসারকে বুঝাইয়া দিয়া, দিনের শেষে অপর্ণা আসিয়া জানালার ধারে বসিল। ছেলেমেয়েদের ভিতর বড়র দল ঠাকুমার কাছে শুইতে গিয়াছে...ছোট দুটিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—এখন আর উঠিবে না। কোলের ছেলেটিকে বেশী রাত্রে তুলিয়া একবার দুধ খাওয়াইতে

হইবে...স্পিরিটল্যাম্প, দুধের বাটি, ঝিনুক ইত্যাদি মাথার কাছে 'টিপয়ে' গুছাইয়া রাখিয়াছে। স্বামী আফিস হইতে ফিরিয়া চা খাইয়া ক্লাবে গিয়াছে...কখন ফিরিবে নিশ্চয়তা নাই।

লাইব্রেরী হইতে আনা বইখানা কোলের উপর খোলা পড়িয়া রহিয়াছে...মন তাহার কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! পাশের বাড়ীর ছাতে বাঁশী বাজিতেছে; যে বাজাইতেছে, সাহিত্যিক স্বামীর মারফত অপর্ণা তাহার পরিচয় জানে।...ছেলেটি কলেজে পড়ে...মাসিক পত্রে কবিতা লেখে...সন্ধ্যার পর বা গভীর নিশুতি রাতে বাঁশীতে সুরের সুরধুনী বহাইয়া দেয়!...সে মুগ্ধচিত্তে অবাক্ হইয়া শোনে...শুনিতে শুনিতে কতদিন হয়ত ঘুমাইয়া পড়ে...বাঁশীর করুণ মধুর সুরের পথে আধ ঘুমন্ত মন তাহার স্বপ্নলোকের বিচিত্র মায়াপুরীতে ভাসিয়া চলে।

আজও সে শুনিতেছিল, কিন্তু বাঁশীতে অন্যদিন যে সব সুর বাজে—এত সে সুর নয়···এ যেন কোন্ এক অতৃপ্ত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ আকুলতা—বাহির হইবার পথ না পাইয়া বাঁশীর বুকে গুমরিয়া কাঁদিতেছে! অপর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিল···এ সুর তাহার—তাহার! এ ছেলেটি এ সুর কোথায় পাইল?

দিন যায়···বছর যায়···বয়স তাহার বাড়িয়াই চলে—কি না-পাওয়ার বেদনায় মন তাহার এমন করিয়া গুমরিয়া কাঁদে! কিসের এ আকুলতা, তাহা সে বুঝিতে পারেনা···কি চায় সে, নিজেই জানে না···কি যে সে পায় নাই তাহাও তাহার হিসাবে ধরা পড়ে না! তবুও কোন অজানা বাসনাকে কামনা করিয়া মন তাহার অশান্ত, চঞ্চল হইয়া ওঠে! জমজমাট সংসারের ফাঁকে-ফাঁকে কী তাহাকে এমন করিয়া ডাকে···সেই আহ্বানে তাহার পূর্ণ ভাণ্ডার আপনা-আপনিই খালি হইয়া আসে যে···!

জানালা দিয়া তারা ভরা আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল···বাঁশীর সুরকে অচিন পথে আলো দেখাইবার জন্যই বোধহয় খণ্ড চাঁদ ছাতের পাশে আসিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল···অস্থির চঞ্চল চরণে একবার সারা ঘরটাতে ঘুরিয়া আসিয়া আবার জানালার ধারে বসিয়া পড়িল। একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে সবেগে মাথা নাড়িয়া সোজা হইয়া বসিল···নাঃ! এসব পাগলামীর প্রশ্রয় আর সে দিবে না···বাজে খেয়াল···আজগুবী স্বপ্ন দেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। আলোর তেজ বাড়াইয়া দিয়া হাতের বই-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।—ধীরে ধীরে আনত আনন তাহার জানালার গরাদে হেলিয়া পড়িল...খোলা পাতা হইতে দৃষ্টি উঠিয়া আসিয়া বাহিরের অন্ধকারে নিবদ্ধ হইল।···বাঁশী বাজিতেছে···অত কান্না সহ করিতে না পারিয়া, চাঁদ,—তারার দলও প্রায়—সরিয়া পড়িয়াছে।···ঘনায়মান জলভরা মেঘের বুকে বাঁশী কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বাজিতেছে···অপর্ণা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল—তাহাকে ডাকিতেছে—আয়···আয়···!···

কোথায় যাইবে সে?···পথ কোথায়?...কেন জানেনা, অকারণে দুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

* *
*

বীরেন আসিয়া ঘরে ঢুকিল—অপর্ণাকে অমনভাবে জানালার ধারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—"মাথা ধরেছে? অমন করে বসে আছ যে? তবে? শরীর খারাপ করেছে নিশ্চয়ই! হবে না? জানালা খুলে বসে আছ—যত বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগছে···এমনিই ত রোজ কর? এতে কারও অসুখ না হয়ে পারে? ছেলে মেয়েটার গায়ে শুদ্ধ 'জোলো' হাওয়া লাগছে! আশ্চর্য্য! তোমার এই কবিত্বের জ্বালায় মারা না পড়ি!...

লজ্জিত অপর্ণা জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া সরিয়া আসিল···ছোট ছেলেটির গায়ে পাতলা একখানা কাঁথা চাপা দিয়া মেয়েটির ফ্রকটা টানিয়া ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিল...কি বলিতে গিয়া স্বামীর শ্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া আর বলা হইল না—দ্রুত পদে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল···খাবার হয়ত সব এতক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে...যা অদ্ভুত ঠাকুর জুটিয়াছে বরাতে তাহার—!

সম্মেলনে

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীর আর ভালো থাকছে না।—কিন্তু সে কথাটা বলতে বাধে। সে সম্বন্ধে নালিশের কারণ ফুরিয়ে গিয়েছে। দয়াময় ওই-দিক্ ধরেই তাঁর দয়ার প্রমাণ দিয়েছেন—আশাতিরিক্ত। লোকে স্থান-পরিবর্ত্তন করে' দেখবার পরামর্শ দেন,—হাসি পায়। বাবুদের স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের সখ মেটাতে পুরী, শিলং এবং প্রাতঃকৃত্য পালনের জন্য সদ্য-প্রসূত একজোড়া অগ্নিহোত্রী ডিম্বও সাদরে গৃহীত হয়েছে। তবু অগ্নিমান্দ্য ঘোচে না! এখন হঙ্গেরির হঙ্গার বা ক্ষুধা মেটাতে দেখা দিয়েছেন 'ভিনিস্',—সেখানে নাকি 'ফিনিশের' ভয় নেই। সেইটাই নাকি এখন যমকে ফাঁকি দেবার 'হোম্'। সোনাগুলো ত সাফ্ হয়ে গেল, ক্রমে দানায় টান্ ধরেছে, তবু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সেই মহাপীঠে উৎসর্গ করা চাই। ভালো, বেঁচে থাকাই পুরুষার্থ। কিন্তু যার পয়সা নেই, ময়শা-মুদী যাকে বাঁচিয়ে রাখে—তার উপায়? তার আবার উপায় কি? অমন চিত্তরঞ্জন, আশুতোষই চলে গেলেন, আজ হরিঘোষের জন্যে এতো দুর্ভাবনা কেনো? লণ্ডনেও লাটেরা মরে।

সাত পাঁচ ভাবছি—এমন সময় নিমন্ত্রণ এলো—প্রয়াগে এবার 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন'—উপস্থিত হওয়াই চাই, এবং কিছু লিখে নিয়েও। ইত্যাদি। যাক্, হিন্দুর ছেলে, এ বয়সে 'না' বলাও ভালো দেখায় না,—প্রয়াগ তীর্থ-রাজ। 'পরে দেখা যাবে' বলে, কিছু ফেলে রাখবার দিন ত চলে গেছে। সুযোগ বলতেই হবে। প্রবাসে বহুদিন কাটাচ্ছি, পরিচিতদের সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে, অধিকন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না—তীর্থ-রাজ। দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম।

কষ্ট না করলে লাভ হয় না—ধর্ম্ম অর্থ দুই-ই। এ যাত্রায় সুবিধা ছিল, নিজেকে কষ্ট করতে হয় না। 'বি-এন্-ডব্লু' রেলে যেতে হয়, লাইনটি তার ব্যবস্থা করেন, সে ভার নিয়ে থাকেন। চল্লিশ ঘণ্টায় আধ-মরা করে ছেড়ে দেন। লাইনটি খেতাব অর্জ্জন করেছে—'কুলি-লাইন'; তর্করত্ন মশাইদের একপাক্ ঘুরিয়ে অস্পৃশ্যতার মোহ কাটিয়ে দিতে সক্ষম।

কাটিহার থেকে সাথীরূপে এক প্রীতিভাজনকে পেয়েছিলুম—স্থূল-দর্শন, বিরাট-ভোজী। সারা পথ অপ্রীতির কাজেই ব্যস্ত রইলেন। প্রত্যেক ষ্টেসনেই তার কিছু আহার চাই—সেটা অবশ্য, ঘুগ্‌নি, পকৌড়ি, রামদানা,—কিছুতে মানা নেই। কিছু না পেলে—জল। দারুণ শীতের

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রেও, তিনি সে সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। বললেন, —ছেলে ছুটিকেও এই তালিমই দিচ্ছেন। শুনে, আশ্বস্ত হলুম,—বীজ রক্ষা এই ভাবেই করতে হয়, নচেৎ জগতটা শ্রী-সম্পদ ভ্রষ্ট হয়ে, কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই হয়ে পড়তো। ছেলে-পুলের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করাই নিয়ম, করলুমও।

প্রভাত আসন্ন,—তখনো আঁধার ঘোচেনি। কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছিলুম। কি একটা ষ্টেসন থেকে গাড়ী ছেড়েছে মাত্র, 'উঠুন-উঠুন' বলে' এমন নাড়া দিলেন, চমকে উঠলুম,—নিশ্চয়ই কম্বলে আগুন লেগে থাকবে। "ব্যাপার কি?"—"এই দেখুন না, গরম আগুন" বলে', এক ঠোঙা পকৌড়ি দেখালে। মুখও চলছে। বললুম—"এ লাইনে ও জিনিষের অভাব তো নেই—এই ভোর পাঁচটায়,—কোরচো কি?" বললেন,—"অভাব নেই—কিন্তু এমন গরমটি প্যাবেন না মশাই,—নিন্।" আশ্চর্য্য জীব। অনেক করে রেহাই পেলুম। বললেন,—"রেলে উঠলেই আমার বড় খিদে পায় মশাই।" বলাই বাহুল্য ছিল। ভগবান যা যা দুষ্কার্য্য করেছেন, তার বাঁচোয়াও সৃষ্টি করেছেন, নচেৎ রক্ষা ছিলনা। ভাল্লুকের দণ্ডে-দণ্ডে জর হয়, সেই ফাঁকে বিপন্নরা বাঁচবার পথ দেখে। কিছু আহারের পর তাঁর বৃথা সময়টার উপর ছিল গাঢ় নিদ্রার দাবী, তাই প্রয়াগ পৌঁছুনো সম্ভব হ'য়েছিল।

পরে, শুভ পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এলাহাবাদ ষ্টেসনে গাড়ি থামতেই, অপরিচিত তরুণদের পরিচিতের মত ব্যগ্র-ভাবে কামরায় কামরায় খোঁজ,—যেন খুন করে পালাচ্ছি। —"এ গাড়িতে প্রবাসী সম্মেলনের ডেলিগেট্ কেউ আছেন?" নিজেরাই মোট নিয়ে টঙ্গায় তুলে দিয়েই—হাঁকাও। ডেলিগেট্ পাকড়াবার উৎসাহ কি। প্রাণটা তখন বলছিল—"বেঁচে থাকো ভাই,—তোমরা থাকতে চিন্তা কি?"

শিবিরে পৌঁছে খাটিয়া নেওয়া গেল,—বিছানা করে দিলে তারাই। তার পরই—প্রাণান্ত! যে দল আসে তাদের হাতেই চা আর খাবার! এতক্ষণে আমার প্রীতি-ভাজন সঙ্গীটি কাজে লাগলেন, বালকদের ক্ষুণ্ণ করার পাপ থেকে বাঁচালেন। তাঁরা জলের ব্যবস্থাদি করে দিয়ে, এবং কোথায় কি করতে হবে বলে দিয়ে, শেষ বললে—"এই দোরের কাছেই থাকবো, যা দরকার হয়, হুকুম করবেন।" ওরে বাপরে, এরা বাড়ী-ঘর ছাড়াবে নাকি? ফিরতে দেবেনা দেখছি,—এ সুখ আর কোথায় পাবো। এরাই আমার দেশের মূলধন, ভাবনা কি?"

কথায়-কথায় শুনতে পাই—"লুচি পাঁটা",—মণ্ডার গন্ধা লাভ হয়েছে। এঁরা সবাই দেখিয়ে দিলেন।

যাক্, যা করতে এসেছি। পূর্ব্বে আসাম—উত্তর-পূর্ব্বে ভাগলপুর, বেহার (পাটনা, মোজফ্ফরপুর), পশ্চিমে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, রায়পুর, ইউ-পির, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, গোরকপুর, কানপুর, কাশী, ফয়জাবাদ প্রভৃতি, রাজস্থানের জয়পুর এবং কলকেতা হতে সমাগত ডেলিগেটদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের আনন্দ উপভোগের জন্যে, এঘর ওঘর করে' সে সাধ মেটালুম। দেখলুম, অনেকেই তাই করছেন। সম্মেলনের প্রধান পাওনাটা এইতেই লাভ হয়। সকলেই শিক্ষিত, সকলেই উৎসাহী। প্রবাস-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ--সকলেই আত্মীয়। এই মিলনের মধ্য দিয়ে একটা অস্ফুট আশা এবং প্রত্যক্ষের অন্তরালে একটা নীরব শক্তির সঞ্চার, স্বতই অনুভূত হয়। যে যেখানেই থাকি, আমরা আছি। আমাদের বাঙলা ভাষায়—ভায়ের মুখে ভায়ের কাছে, দুটো কথা শুনতে, শোনাতে এসেছি। ভাষাই দেশ বলে দেয়, ভাষাই জাত বলে দেয়। সেই ভাষাকেই আশ্রয় করে আমাদের এই সম্মেলন। ভাষাই আমাদের মহাত্মাজির চরকা,—আর কিছুর সাহায্যে এর স্থান পূরণ হয় না।

ছাব্বিশে ডিসেম্বর ছিল অধিবেশনের প্রথম দিন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এ যজ্ঞের আচার্য্য বা মূল সভাপতি।

প্রথানুরূপ মঙ্গলাচরণ, বাণীর বন্দনা, আবাহন সঙ্গীত ও হোতা বরণান্তে সম্বর্দ্ধনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর নাতিদীর্ঘ সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন।

পরে মূল সভাপতি মহাশয় তাঁর অলিখিত, দীর্ঘ মৌখিক অভিভাষণে, বহু জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয়, কাজের কথা শোনান তা সাহিত্য-সম্পর্ক-ক্ষীণ হলেও সাহিত্যের খোরাক যোগায়।

তারপর আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার

সভাপতি—যশস্বী শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় তাঁর সুদীর্ঘ মৌখিক অভিভাষণে, এই অস্পৃশ্য ভারাক্রান্ত দেশে অনেক অজানা জিনিষকে সরস ও সুখসেব্য করে পরিবেশন করেন। অভিভাষণটি লিখিত ও রক্ষিত হওয়াই উচিত ছিল।

সন্ধ্যার পর Subject Committee-র (কার্য্যকরী সমিতির) বৈঠক ছিল। আমার শরীর ওই সব কাজের কথার তাড়স্ সহ্য করবার উপযুক্ত নয় বলে উপস্থিত হইনি। শুনতে পাই ওইটাই নাকি দরকারী কাজ। দরকারী কাজের লোভ আমাকে কোনোদিন টানেনি।

সাতাশে ডিসেম্বর যথারীতি সাহিত্য-শাখার সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, আসন গ্রহণ করবার পর, প্রয়াগ সম্মেলনের অনুষ্ঠান উদ্যোগের প্রাণস্বরূপা, মহিলা-সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভানেত্রী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দের উদ্দেশে লিখিত তাঁর গভীর আবেগপূর্ণ কবিতাটির উদ্বেলিত নিবেদন, দেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিই হয়েছিল এবং সকলেরি হৃদয়স্পর্শ করেছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় 'প্রবাস' কথার শাস্ত্রীয় অর্থ বুঝিয়ে দিলেন তাঁর অভিভাষণটির মধ্য দিয়ে। বুঝলুম গৃহিণীরাই সব, তাঁদের ছেড়ে থাকলেই প্রবাস। সে হিসেবে দূরবীণের সাহায্যে প্রবাসী খুঁজতে হয়। একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা পেলুম। এবার গৃহ-নির্ম্মাণ, সামর্থ্যে কুলায়নি, সে আক্ষেপ রইল না। চিরকাল গৃহেই আছি। কবি বোধহয় আমাদের উদ্দেশ করেই বলেছেন—

"প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে, * * *
যেথা আছি আমি—আছি তব দ্বারে * *

তার পর অর্থ-নীতি শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমান যোগীশ চন্দ্র সিংহ, অর্থনীতি-সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর অভিভাষণটি শোনালেন। যে-বস্তুর সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নেই, সে জিনিষ যে এমন সুমিষ্ট করে পরিবেশন করা যায়, সে ধারণা ছিলনা। আমি জানতাম ক্লোরোফরম্ করে, অজ্ঞাতে রক্ত বার করে নেবার নামই অর্থনীতি। Man lives to learn, কথাটা সত্যি।

পরে—অন্ধ্র য়ুনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির ভায়া যাঁর কবিতাই এতদিন আমরা উপভোগ করে আসছিলুম, দর্শনের একটা দিক্ ধরে তাঁর বক্তব্যটুকু সরস সনেটের মত অল্প কথায় আমাদের শ্রবণে পৌঁছে দিলেন। তাতে ব্রহ্মকে নিয়ে নিদারুণ টানাটানি না থাকায়, অথচ তাঁর আলোচনায় চিন্তার পরিচয় থাকায় উপভোগ্যই হয়েছিল।

তারপর, শিল্প-শাখার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করলেন। অমন সুন্দর বিষয়টি ভালো করে, শুনতে না পাওয়ায়, কোনো পত্রিকায়, সেটি পাঠের অপেক্ষায় রইলুম।

আঠাশে ডিসেম্বর বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করলেন। এ অজ্ঞান দেশ, কাজের কথায় কণ্টকিত বিষয়টির প্রতি একটু ঝুঁকলে যে বাঁচি!

শেষ—'মধুরেণ'র ভার পড়েছিল আমাদের 'বঙ্গ-সরস্বতী নিবাসের শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর উপর। তিনিই ছিলেন—'সঙ্গীত-শাখার' সভানেত্রী। তাঁর অভিভাষণে সঙ্গীত-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার ব্যঞ্জনাদি, বোঝবার বিদ্যা আমার ছিলনা; তথাপি লেখার গুণে তা সকলেই উপভোগ করেছিলেন। কয়েকটি গায়ক-গায়িকার ও যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে রাগরাগিণীর বৈচিত্র্য, পার্থক্য, পরদা, যথা সম্ভব সহজ বোধ-গম্য করবার চেষ্টাও পেয়েছিলেন। হারমনি বোঝাবার জন্যে পিয়োনো ও মেম পর্য্যন্ত হাজির করেছিলেন।

তারপর বিদায় ও বিসর্জ্জনের পালা। বিনয় ও ধন্যবাদের আদান প্রদান। ব্যবস্থা ও ব্যবহার নিখুঁৎ থাকায় বিনয় ও ধন্যবাদে কোথাও অতিরঞ্জন ছিলনা। কাশী সমাগত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সত্যিকার বিনয়ভাষণ, সকলেরি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি বহন করেছিলেন,—বিজয়া-দশমী মূর্ত্ত হয়েছিল।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সরস গল্প, দিল্লী সমাগত সুরেন্দ্র বন্দ্যো (ঠাকুরদা) ও লক্ষ্ণৌ সমাগত শ্রীমান দ্বিজেন সান্যাল ভায়ার রহস্যাভিনয় এবং স্থানীয় যুবকদের 'কচ ও দেবযানী', যেন সম্মেলনের আনন্দ বিভাগ ছিল। চারু শিল্পের দিক

থেকে—'কচ ও দেবযানী'র রূপ, বেশ, ভাবাভিব্যক্তি ও আবৃত্তি অনবদ্য হয়েছিল। অমন একটি দেবযানী, কলিকাতায় যে কোনো রঙ্গমঞ্চের সম্পদ।

এইবার নিজের অপরাধের কথাটাই বলি। বিশিষ্ট গবেষক চন্দ মহাশয় ছিলেন ইতিহাস শাখার সভাপতি। উক্ত শাখার অধিবেশনের সময় নির্দ্দেশ হল, সকাল আটটায়, এবং অনুত্রেও। ছেলেবেলা মর্ণিংইস্কুলে যাওয়া ছিল,—আনন্দের কাজ। এ বয়সে আটটায় আমার প্রত্যুষ। নাকি —ত্যাগাৎ পরতরম নহি, তাই—গুড়ুক ত্যাগ করলুম, চা ত্যাগ করলুম, নস্যে নির্ভর করলুম, তাতেও কুলুলো না। 'প্রবাসী' পাঠে সে খেদ মেটাতে হল।

বঙ্গ-প্রিশ্রুত বিদুষী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ছিলেন মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী। তাঁর মুখে তাঁর অভিভাষণ শোনবার সৌভাগ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু সফলে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তা হতেও আমরা বঞ্চিত হইনি। অভিভাষণটি তাঁর প্রখ্যাত পিতৃকুলের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই—সর্ব্বাংশেই অনুরূপ হয়েছিল।

'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম আবির্ভাব থেকেই, সে মহিলাদের উপস্থিতি ও সাহচর্য্য পেয়ে আসছে এবং ক্রমশই তা বাড়ছে। এইটি পরম আনন্দের ও আশার কথা। এবারেও মায়েদের ও মেয়েদের সংখ্যা বোধ করি ন্যূনাধিক দুইশত ছিল, তন্মধ্যে দূর দেশাগতা অনেকেই ছিলেন। পাঠ, গীত বাদ্য, শিল্প-প্রদর্শনী, সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের চারু ও কারু কলার পরিচয়ে সমুজ্জ্বল ছিল।

ইচ্ছার বিরুদ্ধ হলেও একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের এই 'সম্মিলনী', সাহিত্য শব্দটি বহনে ভারাক্রান্ত হলেও, আমাদের মান্য ও বিশিষ্ট সভাপতিদের সাহিত্যকে যেন বাদ দিয়েই গেছেন,—মাত্র তরুণ সাহিত্যিকদের লেখার প্রতি শেষ কয়েকটি কথায় তাঁদের বক্র ও তীব্র কটাক্ষ পেলুম। সে সম্বন্ধে কারুর বলবার নেই। তাঁরা সদুদ্দেশ্যেই স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করেছেন। নিজেদের সাহিত্যকে সুন্দর ও decent দেখতে কে না চান?

বয়সের-ধর্ম্ম বলেও একটা কথা আছে। তরুণদের বয়স ও আমাদের বয়সে ব্যবধান অনেকটা, কিন্তু ষোড়শ উত্তীর্ণ হলে নাকি মিত্রের কোটায় তুলে নিতে হয়। যেখানে প্রবীণদের বাধছে এবং তা কেনো বাধছে, সেইটে মিত্র ভাবে বুঝিয়ে বললে, আমার বোধ হয় চাবার বস্তুটা পাওয়া কঠিন হয় না। আমাদের নেতারা, সম্পাদকেরা সরকারকে সর্ব্বদাই বলেন "তোমরা কড়া হয়েই ভুল করছো,—ওটা পথ নয়।" আমারও ধারণা তাই। ভুল হয় তোঁ ক্ষমাই প্রার্থনা করবো।

—প্রবাসজ্যোতি

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহানন্দের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পর একটা আশা, জীবনের সাফল্য অনুভব করিয়া আমার অন্তরের মধ্যে সকল সময় খেলা করিতে লাগিল। যেন সর্ব্বার্থসিদ্ধির আভাষ। আনন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শক্তির অনুভব। আমার মধ্যে কত-কত মহৎশক্তির সম্ভাবনা বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। মহানন্দের গুরুভাব তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। এই অপূর্ব্ব সাধুটি চুপচাপ নিজ আসনে, আপনভাবেই সমাহিত, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে আছে কিনা কে জানে! কে বুঝিবে, কি ভাবে, কোন্ শক্তির প্রবাহ কোন্ পথে চালনা করিতেছেন।

নাগরিক জীবনে, নিজ গৃহে বসিয়া, আমরা কত-প্রকারের সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই। এমন সব উদ্দেশ্য লইয়া, আমাদের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হন,—অনর্থক বাক্যচাতুরীর অবতারণা করেন;—এমনই সাংসারিক ভোগ, আসক্তি এবং অর্থলোলুপতার পরিচয় দেন যাহাতে ত্যাগী সাধুসম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চিত হইয়া সরল গৃহস্থ-মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। সাধু-সঙ্গের মহৎ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তাহাতেই বুঝি—গৃহস্থ জীবনে যথার্থরূপে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কতটা গভীর তাহা অনুভব করিবার মনোভাবও আর নাই। স্বার্থপর জীবনদ্বন্দ্বে অবসাদগ্রস্ত এবং আসুরিকভাবে জাজ্বল্যমান এই যে এখনকার দুর্ব্বল সংসারী মনুষ্যের মনোবৃত্তি, নির্ম্মল আনন্দ ও শান্তির আস্বাদনে বিমুখ হইয়া বোধ হয় দিবানিশি পুড়িতেছে,—কাহাকেও দেখাইবার নয়—জানাইবারও নয়। জানা নাই কোথায় সেই শান্তির ধারা যাহার স্পর্শে দগ্ধজীবন স্বস্থ হয়, মধুময় হয় এবং শক্তিমান হয়। ভোগমূলক কর্ম্মের প্রবাহে এতটা ডুবিয়া থাকিলে সাধুসঙ্গ লাভ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?—কিন্তু একথাও ভুলিবার নয় যে এদেশে সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে কাম কামী, সংসারমনা, অর্থাসক্ত সাধু সংখ্যায় অনেক হইলেও যথার্থ লোককল্যাণরত, ত্যাগী সন্ন্যাসীরও অভাব নাই, যাঁহারা এই নিরন্তর কর্ম্মক্লিষ্ট, দুর্ব্বল সংসারী মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই জাগ্রত আছেন। যথার্থ সাধুসঙ্গ ব্যক্তিগত প্রবল আকাঙ্খা ও ধর্ম্মরতির যোগাযোগ অপেক্ষা করে।

যাহা হউক মহানন্দের কুটীর-আশ্রমে যাওয়া আসা করিতে-করিতে অনেক কিছুই লক্ষ্য করিলাম। এমনই আশ্রমটির সংস্থান যে সাধুসঙ্গের গভীর আকাঙ্খা না থাকিলে কেহ এদিকে আকৃষ্ট হইবে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত সেথায় অনাবশ্যকীয় কিছুই নাই। শয়নের সামান্য খাটিয়া বিছানা পর্য্যন্তও নাই, কেবল সেই যুবা সাধুটির একখান চেটাইয়ের উপর কম্বল বিছানো, অসময়ে তোলাই থাকে, শয়নকালে পাতা হয়। তার উপর সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার উপযোগী নানাভাবের বাক্যছটার আড়ম্বর না থাকায় সাধারণ কেহ বড় একটা ঘাঁসে না। এই ভাবে তাহার নিজ আশ্রমটি অপূর্ব্ব কৌশলে বাহিরের অত্যাচার হইতে রক্ষা হয়।

যতক্ষণ সুবিধা পাইতাম তাঁহার কাছে বসিতাম। আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা-বাদেরও প্রয়োজন নাই। কতক্ষণ বসিবার পর মনের সন্তোষ হইলে উঠিয়া আসিতাম। এই ভাবে অপার্থিব আনন্দের আভাষ পাইয়া তাঁহার প্রতি যতটা আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম—ততই তাঁহাকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহও বাড়িতে লাগিল। এসম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় এবং গুরুভাব সম্বন্ধে নিগূঢ় জানিবার জন্য একদিন সঙ্কল্প করিয়া যথাস্থানে আসন করিয়া বসিলাম। অন্যান্য দিন যেমন হয় অল্পক্ষণেই মনস্থির হইয়া গেল। তখন আমার প্রথম প্রশ্ন হইল,—

এখানে আসার পর যখন আমার মনস্থির হয়ে যায়,

অনেক জটিল বিষয় সরল, আশানুরূপ মীমাংসাও সহজেই হয়, নানাদিক দিয়েই মনে হয় আপনিই আমার গুরু।

উত্তর,—বুদ্ধি বা বিবেক জেগে উঠলে, যেখানেই আসন করে বসা থাক না কেন সেইখানেই চিত্তস্থির হবে,—আর মনের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—কিন্তু এখানেই যে আমি বিশেষ কিছু পেয়েছি,—

—তা ত নিজগুণেই পাওয়া গেছে। যে যে বিষয় মীমাংসার জন্য অন্তর ছট্‌ফট্ করেছে, স্থির, একাগ্রচিত্তে বসবামাত্র অন্তরাত্মার প্রেরণায় সহজেই মীমাংসা হয়ে গেছে। ব্যক্তি-বিশেষকে গুরুভাবে লক্ষ্য করলেও আসলে এ সকল জাগ্রত আত্মারই অভিব্যক্তি। গুরুভাবে মানুষকে ধরে টানাটানি করার শোগটি দুর্বল হিন্দুসমাজে অধিকাংশ মানুষের সংস্কার-গত।

সত্যই ত! অবস্থা-বিশেষে সাত্ত্বিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ কোনও সাধুকে গুরু বলিয়া আঁকড়াইবার প্রবৃত্তি আমাদের হিন্দুদেরু যেন জন্মগত। পরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক কোন দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া আবার অশ্রদ্ধা আসিতেও দেরী হয় না। অনেকগুলি সংসারী লোককে এরূপ হঠাৎ ভক্তিমান্ হইয়া গুরুগ্রহণ, আবার কোনও কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গুরুত্যাগ করিতেও ত দেখিয়াছি। সেই কারণে আমারও গুরু করিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

তবে কি আমার অদৃষ্টে যথার্থ নিষ্ঠা বা গুরুলাভ নাই?

জীবভাবের উন্নত অবস্থায়—ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে গুরু-শক্তি এলে তাকে ঠেকাবেই বা কে? আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হলে কোন তত্ত্ববিকাশের অবস্থায় উপলব্ধ হয়ে যিনি সুমুখে আসেন, অন্তরে গুরুর স্থানে তাঁকেই দেখা যায়। সেই তত্ত্ববোধ উপলব্ধে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে আনন্দ-সম্ভোগ চলে, তারপর আবার অবস্থান্তর হোলে কাকে উপলব্ধ করে কোন্ তত্ত্ব ফুটবে কে জানে?

তবে কি গুরু এক নয়, এক একটি তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন গুরুর দরকার?

মূলে আত্মা, গুরু বা ইষ্ট একই ত,—কিন্তু চঞ্চলমতি জীবের অসমান কর্ম্মবৈচিত্র্যের জন্য, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সহযোগ প্রয়োজন। তাদেরই একাধিক গুরু মিলে যায়। কারো-কারো এক গুরু উপলব্ধ করে সকল কর্ম্মই শেষ হয়, সকল তত্ত্বই সাক্ষাৎকার হয়। চিত্ত যার সত্যনিষ্ঠ, অহৃদয় সকল যার তীক্ষ্ণ, সর্ব্বব্যবহারে যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ এবং দুর্ব্বলতাশূন্য, কর্ম্ম যার এক ধারায় চলছে এবং অন্তর্দৃষ্টি গভীর,—তারই একমাত্র ব্যক্তি-বিশেষকে উপলব্ধ করে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। এক্ষেত্রে ভালমন্দ, বড় ছোটর কথা নেই। সকলকার কর্ম্মক্রম ত সমান নয় একমুখীও নয়। শক্তিমান সিদ্ধগুরু পেলে সেই একের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। আর উচ্চ আধার না হোলেই বা শক্তিমান গুরুর সাথে যোগাযোগ ঘটবে কি করে?

একটা কথা পরিষ্কার হইয়া গেল, আনন্দ পাইলাম,—কিন্তু আর একটা কথা মনের মধ্যে গোল পাবাইতে লাগিল, —সেটি গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ও ব্যবহারের কথা।

চিত্তের মধ্যে যখন কোনও তত্ত্বের স্ফুট উঠে, সেই তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য, সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণ যখন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন, পূর্ব্বে যাঁর সে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়েছে তাঁরও অন্তরে সাড়া জাগে। তারপর আমাদের প্রকৃতি আছেন, যাঁর আসল কাজই হোলো সমধর্ম্মী একের সাথে অপরের যোগাযোগ ঘটানো, চুম্বকে লোহাতে যৌগাযোগের মত, তিনি ঠিক তাঁদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

তা হোলে এর মধ্যে আর একজনের হাত আছে!

আছে বৈ কি?—না হোলে পুরুষ প্রকৃতির রাজত্ব চলবে কেমন করে! যিনি চোরের চুরির যোগাযোগ, হন্তব্যের সঙ্গে হত্যাকারীর যোগাযোগ ঘটান, প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িণীর যোগাযোগ ঘটান, কর্ম্মীর সঙ্গে অভিষ্ট কর্ম্মের যোগাযোগ ঘটান,—সেই প্রকৃতিই অবলীলাক্রমে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। এক্ষেত্রে দূর বা নিকটের কোনও প্রশ্নই নেই। এই ঘটাঘটির ব্যাপারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে অবস্থিত বস্তু বা প্রাণীর নিশ্চিৎ যোগাযোগ ঘটে যায়। অপূর্ব্ব এই প্রকৃতি—যাঁকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়েছে,—তাঁকে এই ভাবেই স্পষ্ট ধরা যায়। পূর্ব্ব-পূর্ব্বদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা এই ভাবেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁকে ধরেছেন।—

সকল ব্যাপারেই তা হোলে প্রকৃতি মধ্যবর্ত্তিনী? না হোলে কি করে হবে?—সৃষ্টির ব্যাপারে গোড়ার কথাটি ভুললে চলবে কেন।—মূল-সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের এমনই যে শুধু একের দ্বারা কিছুই হবার উপায় নাই। পুরুষের ইচ্ছা হয়,—আর প্রকৃতি, সেই ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটান। দুইয়েরই আনন্দ থেকেই প্রবৃত্তি বা স্ফুট উঠে,—আনন্দময় পুরুষের আনন্দ থেকেই ইচ্ছার স্ফুট উঠে—আর আনন্দময়ী প্রকৃতির আনন্দ থেকেই পুরুষের ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটাবার প্রবৃত্তি হয় তাইতেই সৃষ্টির মধ্যে উভয়ের অস্তিত্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই ভাবেই সার্থক হয়। এই থেকেই ত ভারতের সকল শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি। রূপকের আবরণে এই তত্ত্বই ত মূলে আছে।

তা হোলে, এর মধ্যে আবার গুরুতত্ত্ব এলো কোথা থেকে? সৃষ্টির গোড়া থেকেই, আপনহারা হয়ে জীব বহির্ম্মুখী—প্রকৃতির রাজ্যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যত কিছু ভোগ সেই ভোগ কামনায়ই তার পুনঃ পুনঃ গত্যাগতি। তার মধ্যে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটছে, আবার নানাবিধ কর্ম্ম ও ভোগের ফলে ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞানও সঞ্চিত হচ্ছে। আত্ম-চৈতন্য যে ক্রমে স্বরূপচ্যুত হয়ে জীবভাবে এই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের মধ্যে এসে কর্ম্ম ভোগে পড়েছেন, সেটা অনুলোম গতি,—আর ভোগান্তে যে ক্রমে চৈতন্য স্বরূপে মিলছেন সেটি বিলোম-গতি। এই অনুলোম ও বিলোম গতিতে যাওয়া-আসা যেন অনন্তকাল ধরেই চলেচে। এখন গুরুর কথা—

এখানে এইভাবে গত্যাগতির ফলে, কর্ম্ম ও ভোগের চরম অর্থাৎ পরিসমাপ্তির অবস্থায় যে যে আত্মার এই সৃষ্টি-রহস্য ভেদ হয়েছে,—আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও যাঁরা পরমাত্মায় লয় হয়ে যাননি, তাঁদের উপলব্ধ তত্ত্ব সকল,—এবং যে ক্রমে তাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তার দ্বারা নিরন্তর সূক্ষ্মভাবে আকাশের মধ্যে দিয়ে জীবসমাজে প্রবহমান রয়েছে। তাঁরাই সৎ গুরু। আত্মার দ্বারাই আত্মার মুক্তির পথ। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মাই গুরু। এখানে আত্মারামেরই খেলা। যা কিছু জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভোগ এই সৃষ্টির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন চলছে বা সৃষ্টিকে গুলজার করে রেখেছে তা সবই আত্মায়-আত্মায় সম্পর্ক ধরেই,—কখনও একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্নভাবে নয়। তাইতেই সৃষ্টির সার্থকতা। পরমাত্মা এবং সৃষ্টির মধ্যে শক্তিমান, চৈতন্যমুখী জীব-সমূহের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র হয়ে তাঁরা অবস্থিত। তাঁদের আত্মজ্যোতিঃ থেকে চৈতন্যরশ্মি প্রাকৃতিক নিয়মেই বৈরাগ্যবান, চৈতন্যমুখী, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি পুরুষের অন্তরে দীপ্তি দেয়। সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকালব্যাপী তাঁদের প্রভাব জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে।

ত্রিগুণের অতীত হবার পূর্ব্বে গুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে, শেষ, সত্ত্বগুণের গণ্ডী ছাড়াতে গিয়ে তাঁরা সর্ব্বদের বাধা পান। লোককল্যাণ, জীব-জগতের কল্যাণ কামনা করে বসেন। এই যে জগৎ সংসারে জীবকোটি অজ্ঞানের মধ্যে নিরন্তর ভোগ কামনা ও ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তাদের অজ্ঞান দূর করে পরম পদ আত্মস্বরূপের অপার আনন্দময় অবস্থায়, তাদের ঊর্দ্ধে করবার জন্য ব্যাকুল হন, সাযুজ্য, মোক্ষ এ সকল তাঁরা তখন চান না। তাঁরা পরমাত্মার সংস্পর্শে থেকে জগতের মধ্যে চৈতন্যের বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করতে চান। সেই গুরু-ধারার সঙ্গে নিরন্তর সংযোগের ফলে তাঁরাও এখানে গুরুপদবাচ্য। অপরাপর নবীন অধিকারীরা আত্মচৈতন্য স্ফুরণে তাঁদের সাক্ষাৎ প্রভাব ও সহায়তা পান। পরে তাঁরা আবার আদর্শ হয়ে যান,—এই ভাবে গুরুধারার পারম্পর্য্য রক্ষা হয়ে চলেছে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশও চলেছে।

অপূর্ব্ব এই গুরুতত্ত্ব,—আজ যে বস্তু পাইলাম,—জানি না জন্ম-জন্মান্তরের কতটা সুকৃতি থাকিলে এ তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার হয়। আমার জীবন ধন্য বোধ হইল। এখন যে বস্তু শ্রবণে পাইলাম, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হইলে, সৎগুরু সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিলে তবেই না আমার জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে। আমার মধ্যে কিন্তু ইহার পরেও আবার প্রশ্ন উঠিল—কুলগুরু প্রথার ব্যাপারটি কিরূপ?

—ক্রমশঃ

গান

—গল্প—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দেবাশিস বিয়ে করে' বউ ঘরে নিয়ে এলো।

মেয়েরা সবাই ফিস্‌ফিস্ করে' বলাবলি করতে লাগ্‌লো : এ আবার কেমন-ধারা পছন্দ! দেবুর মাথা-টাথা বিগ্‌ড়ে গেলো নাকি?

—'যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি।' দু'জনেই যে সমান কালো, দিদি।

—ঐই তো বাবা ছুরৎ তায় বউর চলন দেখ না। ঠিক যেন তুর্কি-ঘোড়া লাফিয়ে-চল্‌ছে। কল্‌কাতা থেকে এ তুই কী ধরে' নিয়ে এলি, দেবু?

—পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আবার আলতা পরেছে। যেমন রূপের ডালি, তেমনি গুণের জাহাজ। কোন্ গুণে ও তোকে বশ করলো শুনি?

স্মিতস্বচ্ছ মুখে দেবাশিস বল্‌লে : এদের তুমি একটা গান শুনিয়ে দাও তো, মনো।

গান! গান! মনোবীণা যখন গান গা'য় তখন তা'র সমস্ত শরীর-সুরের আগুনে দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠে। অন্ধকার অপসারণ করে' সূর্য্যের আদিম উদয়ের মতো তার কালো দেহের ওপর জ্যোতির্ম্ময় আত্মার আবির্ভাব হয়, সুরের রক্তচ্ছটা স্নায়ুতে-শিরায় বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। তখন তাকে আর একটা শরীর মনে হয় না, মনে হয় আগুনের একটা শিখ।

দেবাশিস মুগ্ধ হয়েছিলো মনোবীণাকে দেখে নয়, শুনে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাঝে চোখকেই কেবল খাতির করতে হ'বে দেবশিসের রূপ-জিজ্ঞাসায় এমন কোঁনো পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। মনোবীণাকে সে উদ্‌ঘাটিত দেখলো তা'র শ্রুতির মাধ্যমে; প্রত্যক্ষদৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় নয়, অনুভূতির বিহ্বল গভীরতায়। তাই, যা আমরা দেখি, তার চেয়ে বেশি সত্য বেশি গভীর যা আমরা শুনি। দেখার যে প্রতিক্রিয়া তা সুরু হয় আমাদের দেহে, শোনার প্রতিক্রিয়া অলক্ষ্য গোপনে অন্তরে চলতে থাকে। দেখা হচ্ছে সীমাবদ্ধ, কিন্তু শোনার স্থায়িত্ব বহুক্ষণের : দেখায় আমরা আক্রান্ত হই, কিন্তু শোনায় হই অভিভূত। দেখার দীপালোকে সমস্ত রূপ যেন একসঙ্গে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু শোনার থেকে মনে যে সম্মোহ উপস্থিত হয় তা'তে রূপ যেন সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না, তাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে মন আপনা থেকেই ইচ্ছামতো সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে।

এবং এই গোপন সৃষ্টিক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দেবাশিস মনে-মনে মনোবীণাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলে' অভিবাদন করলে। তা'র বি-ই কলেজের বন্ধু সত্যভূষণ 'C, N, R,' হ'য়ে চলে' যায় গ্লাসগো য় : সেখান থেকে কৃতবিদ্য হ'য়ে কল্‌কাতায় ফিরে এসে সরকারি চাকরি পেয়ে বালিগঞ্জে বাড়ি ফেঁদেছে। তা'রি ওখানে বেড়াতে এসে দেবাশিস তা'র বোন মনোবীণার গান শুন্‌লো। তা'র গান শুন্‌লো না বলে' মনোবীণাকে শুন্‌লো—এমন কথা বলতে পারলেই অর্থ টা জোরালো হ'তো। অন্য চতুরিন্দ্রিয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে সোজাসুজি কর্ম্মকারকরূপে ব্যবহার করা যায়, কেবল শোনার বেলায় শুনতে হ'বে তাঁ'র কথা, তা'র গান, তা'র সোচ্চার হাসি। সত্য কথা বল্‌তে কি, দেবাশিস তা'র গান শোনেনি, শুন্‌লো গীতপরা এই মনোবীণাকে : তা'র সমস্ত শ্রুতিশক্তিতে কেন্দ্রীভূত করে' সে মনোবীণাকে উপলব্ধি করলে।

কারো বা রূপ শারীরিক লীলা-উল্লাসে, কারো বা বিভ্রমগুনে, কেউ বা জন্ম থেকেই এমন রূপাঙ্কিতা যেন "আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব।" কিন্তু মনোবীণার রূপ গোচরীভূত শরীরে নয়, অধিষ্ঠান করেছে তা'র দীপ্ত—তা'র উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরে। অর্থাৎ এ-রূপ সে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জ্জন করেনি, জন্মাধিকারসূত্রে সৃষ্টি করেছে। এবং যা সজ্ঞান সৃষ্টির ফল তা'তেই যে ব্যক্তিত্ব

বেশি প্রকাশিত হ'বে তা না বল্‌লেও চলে। দেবাশিসের এমন বয়েস নয় যে গ্রীক ম্যাগ্‌ডেলিন বা ভিক্টোরিয় যুগের ডলিকে ভালো লাগবে, ততো রূপকে নয়, যতো সে প্রাধান্য দেয় ব্যক্তিত্ব:কে। তাই মনোবীণাকে যে তা'র সাধারণের কিছু অতিরিক্ত বলে' ভালো লাগবে তাতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই।

দেবাশিস এটোয়ায় ইঞ্জিনিয়ার—লম্বা ক' মাসের ছুটি নিয়ে কল্‌কাতা এসেছিলো শরীর সারাতে, স্থান-পরিবর্ত্তনে ততো নয়, যতো চিকিৎসায়। মনোবীণার গান শুনে সে যেন টের পেলো অসুখটা তা'র শরীরে নয়, মনে : ডাক্তারি ইলেক্‌ট্রিক ট্রিট্‌মেণ্টে শরীরের যতো না সে উপকার বুঝেছে তা'র বেশি ফল হ'লো তা'র মনে এই মনোবীণার গানের আকস্মিক তড়িৎ-সঞ্চারে। সুরের সেই সূক্ষ্ম তাড়িত তরঙ্গগুলি যেন তা'র অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীকে উজ্জীবিত করে' তুল্‌লো।

সংস্কৃতকাব্যে যাকে বলেছে বেদিবিলগ্নমধ্যা, তেমনি কৃশ কিশলয়ের মতো কমনীয় একটি কালো মেয়ে এই মনোবীণা দু'হাতে অর্গানের চাবি টিপে সুরের তুফান তুললো। Bull's Eye-র মতো এক টুকরো ছোট কালো মেঘ যেমন কোথা থেকে দ্রুত ছুটে এসে আকাশের দশদিঙ্মুখ আচ্ছন্ন, অন্ধ করে' দেয়,—সুরু হয় তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি, তেমনি মনোবীণার গলা থেকে প্রথম একটি করুণ, মিঠে আওয়াজ বা'র হ'য়ে পরে বহুবিসর্পিত হ'তে-হ'তে ঘরের সমস্ত শূন্যতা ভারাক্রান্ত করে' তুললো, সুরু হ'লো গমকের বিদ্যুৎ, মূর্চ্ছনার তুফান। দেবাশিসের মনে হ'লো এ তা'র কণ্ঠের স্বর নয়, আত্মার প্রার্থনা। তা'র দেহ সমাহিত, স্থির; মুখে কোমল শান্ত লাবণ্য; দুই চোখ স্ফুরিতোজ্জ্বল; মাখনের মতো নরম, চঞ্চল আঙ্‌ুলের প্রান্ত থেকে পলায়মান লীলা ক্ষণে-ক্ষণে পিছলে পড়ছে। দেবাশিস বিভোর হ'য়ে একটার পর একটা গান শুনতে লাগ্‌লো। সে-শোনার প্রতিধ্বনি বাজছে তা'র রক্তে নয়, তা'র কোমল ভাবতন্তুতে : কেননা দেখতে মনোবীণা গোলাপ নয়, এনিমোন্; আর আমরা সবাই জানি রক্ত থেকে গোলাপের জন্ম, এনিমোনের জন্ম হচ্ছে অশ্রুজলে।

বলাই বাহুল্য হ'বে যে দেবাশিস শরীর সারাতে উঠেছিলো এসে এই বালিগঞ্জে, সত্যভূষণের বাসায়। বহুলতরো হ'বে এ বলা যে গানের অলৌকিক সুর ছেড়ে দিব্যি সাদাসিধে মাজা-ঘষা কথায় মনোবীণার সঙ্গে তা'র আলাপ-আলাপন হ'লো। এবং এদের নিয়েই গল্প যখন লিখ্‌তে বসেছি তখন না বললেও চলবে এদের মৌখিক পরিচয়টা দিনক্রমে আন্তরিক সৌহার্দ্যে হ'লো রূপান্তরিত। সে-সৌহার্দ্য মনোবীণা কী ভাবে নিয়েছিলো জানি না, কিন্তু দেবাশিসের কাছে মনে হ'তে লাগ্‌লো একপেশে, অসম্পূর্ণ। মানুষের সম্পূর্ণতা তা'র আত্মিক ও কায়িক চেতনার সমন্বয়ে; তাই অর্দ্ধসুপ্ত বা অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন বন্ধুতায় সে খুসি নয়, কেননা তাতে তা'র জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণতাই হচ্ছে ব্যাহত। অতএব, এক কথায়, মনোবীণাকে সে বিয়ে করতে চাইলো।

প্রস্তাবটা যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনি লোভনীয়—সত্যভূষণ উঠলো লাফিয়ে। মনোবীণার যে এমন ভাগ্য হ'বে এ কেবল এতোদিন তা'র বিধাতাই জানতো, খবরটা এবার তা'র আত্মীয়-স্বজনের কানে উঠলো। পড়ে' গেলো সোরগোল, এবং দেখা গেলো গোলে হরিবোল দে'য়ার মতো সেই কোলাহলে মনোবীণাও কখন তা'র স্বর মিলিয়েছে।

বিয়ে করে' মনোবীণাকে নিয়ে চললো সে তা'র দেশের বাড়ি—অজ-পাড়াগাঁয়ে। তা'র মা-বাবা নেই, কিন্তু আছে তবু এক বৃহৎ পরিবার, যাদের দূর পশ্চিমে গিয়ে দেশের প্রথা-আচারে জলাঞ্জলি দে'য়ায় ঘোরতর আপত্তি, যাদেরকে সে মাসে-মাসে মোটা টাকা পাঠিয়ে সম্পর্কের সম্মান রাখছে।

দেবাশিস্ ইঞ্জিনিয়ার—ময়দানবের প্রতিনিধি, মূর্ত্তিমান যন্ত্রদেবতা : মনোবীণা হচ্ছে যন্ত্রের অতীত সেই অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ। দেবাশিসের কাজ উৎপাদন, মনোবীণার হচ্ছে সৃষ্টি! দুই ভিন্নগুণের গ্যাস্ মিলিয়ে যেমন জল তৈরি হয়, তেমনি তাদের বাহু ও কণ্ঠের যোগফলে কী অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ সূচিত হ'বে তা কেউ বলতে পারে না!

দেবাশিস হেসে বল্লে,—হ'লো তো তোমার পাড়া-গাঁ দেখা ?

হেসে মনোবীণা পাল্টা জবাব দিলে : হ'লো তো এদের তোমার শহর দেখানো ?

শরীর সেরেছে, ছুটিও ফুরিয়ে এসেছিলো ; দেবাশিস বল্লে,—চলো এবার এটোয়ায় ফিরে যাই।

মনোবীণা বল্লে,—Amen.

আগ্রা-বিভাগে এই এটোয়া, যমুনার থেকে আধ মাইল পূবে, কল্‌কাতার থেকে সাতশো মাইলেরো বেশি তা'র ব্যবধান—স্বামীর সঙ্গে মনোবীণা সেখানে ঘর করতে এলো। হিউমগঞ্জে তাদের বাসা, বাঙলো প্যাটার্নের, চারদিকে মাঠ—চাকর-চাপ্‌রাশি, বয়-খানসামা : মনোবীণার সেখানে অবাধ আধিপত্য। তা'র মোটর-সাইক্লে করে' দেবাশিস সকালে চারটি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ে, আজ গোয়ালিয়র, পশু আবার ফরাক্কাবাদ ; কখনো বা আগ্রা, কখনো বা মৈন্‌পুরি। সমস্ত দিনটা মনোবীণার একলার এলেকায়, ঘর সাজিয়ে বই পড়ে' ছবি দেখে স্বামীর ফেরবার প্রতীক্ষা করে' কোনোরকমে গোঁজামিল দিয়ে সে চালায়। রাত্রের দিকে দেবাশিস্ ফিরে এলে সে তখন তা'র বাজনা নিয়ে বসে। আগে সে নিজেকে শোনাবার জন্যে গান গাইতো, এখন স্বামী শুনবেন না ভাবলে তা'র আর মুখ খুলতে ইচ্ছে করে না।

মাঝে-মাঝে যখন ছুটি-ছাটা হাতে আসে, তখন তা'রা বেরিয়ে পড়ে শহর দেখতে। রোমে এসে রোম্যানদের মতোই ব্যবহার করা উচিত। বেরিয়ে পড়ে তারা সেই পুরোনো দুর্গ দেখতে—তা'র সেই বিপুল বলবান ধ্বংসস্তূপে, জুম্মা-মসজিদে, কখনো বা 'অথালায়', হিন্দু-মন্দিরে। সমস্ত শহরের গায়ে এখনো যেন সেই বীর-বর্ব্বর যোদ্ধার তেজস্বী অস্ত্রাঘাত লেগে আছে। কখনো বা যায় তারা যমুনার স্নানের ঘাটে মেলা দেখতে, কখনো বা চলে' আসে শহর ছাড়িয়ে সেই 'ত্রিজী মহাদেও'র মন্দিরে, কৃত্রিম সেই টিলার ওপর, সেখান থেকে শহর ও তা'র চারধারের গ্রাম-বসতিগুলি কী সুন্দর যে দেখায় !

তা ছাড়া, মনোবীণা একেবারে একলা : সমস্ত দিনব্যাপী তা'র ধূ ধূ নির্জ্জনতা। মনে হয় এই নীরবতাও যেন তা'র গান, অন্তরার খাদের মতোই স্তিমিত, বিষণ্ণ। পরক্ষণেই দেবাশিসের বাইকের শব্দে সে-নীরবতা হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে ! তার অন্তরে জাগবে ঢেউ, শরীরে ফুটবে রেখা। এই মহামৌন ছেড়ে মনোবীণা হঠাৎ গানে-গল্পে উন্মুখর হ'য়ে উঠবে।

দু'ধারি গাছের ছায়ায় অন্ধকার রাস্তায় দেবাশিসের সাইক্লের আলো দেখা যায়···তার আগে আসে শব্দ ! মনোবীণা বাইরের বারান্দায় ছুটে আসে, থল্‌থল্ করে' কথা বলতে সুরু করে। সে কতো কথা ! দেবাশিস খোলস খুলে ভদ্র হ'য়ে জলখাবারের টেব্‌ল নিয়ে বস্‌লে সুরু হয় গান। ফরমায়েসি গান ছেড়ে পরে নিজের ইচ্ছে-মতো ! অনর্গল গান, অনবরত গান। গানের উত্তরঙ্গ সমুদ্র। গানের ঘূর্ণি, গানের টর্নেডো। দেখতে-দেখতে মনোবীণার শরীরে সৌন্দর্য্যের জোয়ার ডাকে, তাকে ঘিরে লাবণ্য যেন মথিত হ'তে থাকে। তারপর হাতের কাছে আর বাজনা থাকে না, তবু ঘুরে-ফিরে হাতের কাজ করতে গিয়ে তা'র ক্ষিপ্র পদক্ষেপে, শরীর-লীলায় গান ঝরে' পড়ে। মনোবীণার এই প্রাণ-অণু সঙ্গীতে উচ্ছ্রিত হ'য়ে পড়ছে তা'র দেহে : শেইক্‌সপিয়রের সেই কথা মনে হয় :

'There's not the smallest orb which thou behold'st
But in his motion like an angel sings.'

তারপর গান থামিয়ে মনোবীণা স্বামীর সঙ্গে বাইরে চেয়ার টেনে বসে। তখনো সেই গানের বিরতি নেই। আকাশের তারায়-তারায় সে-গান সহসা সুরময় হ'য়ে ওঠে—পিথাগোরাস যা শুনেছিলো ; প্রতি গ্রহে, প্রতি তারায় প্লেটো দেখেছিলো এক সাইরেন্, পার্শ্ববর্ত্তিনী সাইরেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে গান গেয়ে চলেছে। মনোবীণা হচ্ছে এই পৃথিবীর সাইরেন্, তা'র সুর মিলেছে ঐ তারার সুরের সঙ্গে। স্ত্রীকে আর দেবাশিসের মর্ত্ত্যচারিণী মানবী ব'লে মনে হয় না।

গানের ঢেউয়ে তা'র সারাদিনের ক্লান্তি যায় ধুয়ে, রুক্ষতা হ'য়ে আসে কোমলতরো। তা'র সমস্ত অস্তিত্ব যেন সে-গানের জলে স্নান করে' ওঠে, সে-গানের হাওয়ায় তা'র মনের

লাখো-লাখো জান্‌লা দিকে-দিকে খুলে যায়। তারপর রাতের গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে সে-গান ফেনায়িত নিঃশব্দতায় স্পন্দিত হ'তে থাকে। তারপর রাত পুইয়ে গেলে সেই প্রাচীন Provencal-দের মতো তারা গান গেয়ে ওঠে : 'Ah God ! Ah God, that day should come so soon !'

দেবাশিসের অসুখ ছিলো পেটে : পেটের সেই ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠলো।

বিয়ের পর মনোবীণা রেখেছিলো তাকে নিয়মে বেঁধে, খাওয়া-দাওয়ার সীমাবদ্ধ পরিমিতির মধ্যে। কিন্তু ছ' মাস যেতে-না-যেতেই সেই আধো-নিবন্ত ব্যথাটা হঠাৎ দাউ-দাউ করে' জ্বলে' উঠলো।

ডাকা হ'লো বড়ো ডাক্তার, চল্‌লো আপ্রাণ শুশ্রূষা—ব্যথাটা দু'দিন যদি বা থামে, তৃতীয় দিনে স্থূল একটু পথ্য পড়লেই তা আবার দেখা দেয়। নাভিমূল থেকে সুরু করে' একটা সাপ যেন সমস্ত পাকস্থলীতে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে—আর একটা কঠিন তপ্ত শলাকা যেন বুকের ডান দিকের পাঁজরা থেকে উঠে এসে মেরুদণ্ডে গিয়ে ধাক্কা মারে।

ব্যথা যখন দেখা দেয় তখন দেবাশিসের সমস্ত শরীর দুম্‌ড়ে-মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। সে যে সেই মানুষ তখন আর তাকে চোখ চেয়ে চেনা যায় না—মনে হয় জড় একটা মাংসপিণ্ড। সূর্য্যের সমস্ত আলো তেতো, পৃথিবীর সমস্ত হাওয়া বিষ ! তারপর ব্যথাটা যখন একটু পড়ে, ভীত, স্তিমিত চোখে চেয়ে দেখে মনোবীণা তা'র মাথায় হাত রেখে শিয়রে চুপ করে' বসে' আছে। দুশ্চিন্তায় সে-মুখ কালো, গভীর নিরাশায় একেবারে কুৎসিত। তার শরীরে নেমেছে ভয়-গাঢ় মন্থরতা, একটা মুহ্যমান আবেশ : চোখে সেই দীপ্তির বদলে শুভ্র একটা বিবর্ণতা মাত্র।

প্রথম-প্রথম ভাঙা শরীর নিয়েই দেবাশিস কাজে বেরোতে গেছ্‌লো, বাইকে নয় টাঙায় করে', কিন্তু পথের লোক ধরাধরি করে' তাকে যখন বাড়ি বয়ে' আনলো, দেখা গেলো সে অজ্ঞান, মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে। তারপর কাজে আর তাকে যেতে দে'য়া হয়নি, কিন্তু কামাইয়েরো একটা সীমাবিধি আছে। দেবাশিস ফের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলো। দরখাস্ত মঞ্জুর হ'লো না।

—এখন উপায় ? মনোবীণা আঁৎকে উঠেছে।

বালিশটা দৃঢ় করে' পেটের ওপর চেপে ধরে' উপুড় হ'য়ে দেবাশিস প্রায় আর্ত্তনাদ করে' উঠলো : উপায় আবার কি ! কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে' যেতে হ'বে।

—কোথায় যাবে ?

—কোথায় আবার যাবো ! কল্‌কাতায়। এখানে থাকলে আমি আর বাঁচবো না।

সত্যভূষণ এর মধ্যে রাজসাহি বদলি হ'য়ে গেছে, বাসাটা রেখে গেছে ভাড়াটের জিম্মায়। পত্রপাঠ সে-বাসা পাওয়া যাবে না। তা'র এক আত্মীয় ভবানীপুর অঞ্চলে ছোট্ট একখানা বাড়ি ঠিক করে' দেবাশিসকে টেলি করে' দিলো।

এটোয়ার বাড়ির সঙ্গে কল্‌কাতার বাড়ির তুলনাটা নিতান্তই অনর্থক শোনাবে। সব চেয়ে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে আবহাওয়ায়, চারদিকের নিকটতম পরিবেশে। সেখানে দেবাশিসের ছিলো কর্ম্মোদ্‌যাপনের বহুব্যস্ততা, আর মনোবীণার ছিলো বহুবিস্তীর্ণ বিশ্রাম। দাঁড়ি-পাল্লা গেছে উল্‌টে, কাজের ঠেলায় মনোবীণা উঠেছে উঁচুয়, আর বিশ্রামের ভারে দেবাশিস গেছে নিচে তলিয়ে।

এতো সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবারো তা'র কারণ ছিলো না, কিন্তু মনোবীণার গলায় আর গান নেই। তা'র এই আকস্মিক নিরুচ্চারতায় চারদিক থেকে ক্লান্তিময় অপার শূন্যতা উথলে উঠেছে। তা'র গীতহারা কণ্ঠ যেন মৃত্যুর নির্ব্বাক-গম্ভীর নিষ্ঠুর এক সঙ্কেত।

থেকে-থেকে সেই ব্যথা শত-লক্ষ ফণা ফুলিয়ে পেটের মধ্যে ছোবল মারতে থাকে, যন্ত্রণায় অন্ধ, অন্ধকার চোখে দেবাশিস তা'র সেই পরিচিতা মনোবীণাকে যেন আর দেখতে পায় না। মনোবীণা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় কখনো মাথায় পাখা করে, হট-ওয়াটার ব্যাগ এনে ফোমেণ্ট করতে চায় কখনো, কখনো-বা কী করবে বুঝতে না পেরে তার গায়ের ওপর দুর্ব্বল হাত বুলায়। দেবাশিস চেয়ে দেখে মনোবীণার

অবাধ্যর দুই চোখে জল নেমেছে। সেই অশ্রু-আবিল মুখের চেহারা তা'র মনে হয়, কুৎসিত—এই পারিপার্শ্বিকতার মতোই অপরিচ্ছন্ন। সে মুখের প্রতিটি রেখা বেদনায় রুক্ষ, কঠিন—তাতে আর সেই গীতস্ফূর্ত্তির তরল পেলবতা নেই, নেই সেই কোমলতার আভা। সে-মুখ যেন একটা কলঙ্ক-পিণ্ড।

দেবাশিসের স্পষ্ট মনে হয় এ-মনোবীণাকে সে ভালোবাসে নি। তা'র গলায় গানই যদি ফুরিয়ে গেলো, তবে আর তা'র অস্তিত্ব ব্যক্ত রইলো কোথায়? সে তো এখন একটা নিঃশব্দতার মৃতস্তূপ। শোকান্ধকারের কালিমায় তা'র বর্ণ, সেখানে আর নেই সেই প্রাণের শাণিত বিদ্যুৎ-দীপ্তি। সে যেন—এখন তা'র সেই উদ্দাম প্রথম প্রেমের মুমূর্ষু দীপশিখা!

যন্ত্রণার মধ্যেই দেবাশিস চেঁচিয়ে ওঠে: গান, একটা গান গাও, মনো। আমি মরি তো মরি, কিন্তু তুমি বাঁচো। তুমি বাঁচো। আমারই মতন তুমি গলা খুলে দাও, গান গেয়ে ওঠো।

তা'র আর-আর কাতর প্রলাপোক্তিরই একটা মনে করে' মনোবীণা বিছানার ধারে চুপ করে' বসে' থাকে। ডাক্তারের কথা মতো ওষুধ ঢেলে দেয়, ফলের খোসা ছাড়াতে বসে। আবার সংসারের অন্য কোন্ কাজে উঠে যায়।

ব্যথাটা খানিক জুড়িয়ে এলে নিজের রোগজীর্ণ ব্যথা-বিক্ষত দেহটার দিকে দেবাশিস খানিকক্ষণ সস্পৃহচোখে চেয়ে থাকে। কী সে পরের গলায় গান শোন্‌বার জন্যে এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, গান ছিলো তা'র নিজের দেহে, উচ্ছল মাংসপেশীতে, সতেজ রক্তধারায়। সে-গানই সে এতোদিন শোনে নি: প্রাণের সেই মহান, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা—এখন আর গান নেই, আর্ত্তনাদ। দুই মুঠোয় চুল টেনে ধরে' দেবাশিস নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। প্রতি রোমকূপে, প্রতি রক্তকণায় মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে যে সঙ্গীতসুর অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠেছিলো তাই সে উপেক্ষা করে' এসেছে। সে মাত্র স্বরের সুরা নয়, রক্তের কল্লোলফেনা। সে গান সে দেহের অঞ্জলিপুটে প্রাণ ভরে' পান করতে পারলো না।

শুয়ে শুয়ে জান্‌লা দিয়ে সে পথের লোকজন দেখে। দেখে মনে হয় তা'রা যে বেঁচে আছে, তাদের দেহে যে রয়েছে প্রাণধারণের অপরিমিত ছন্দ—এই কথাই তাদের মনে নেই। দেহের দুয়ারে কান পেতে তা'রা এই রক্তের গান শুনতে পাচ্ছে না। অথচ গানের তৃষ্ণায় আর্ত্ত, পীড়িত হ'য়ে তারা এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করছে। নিজের শারীরিক অস্তিত্বের মাঝেই যে তাদের আত্মার পরিপূর্ণতা, এ-কথা তাদের কে শোনাবে?

ছিপির সঙ্গে শক্ত করে' আঁটা প্যাঁচালো কর্ক-স্ক্রুর মতো ব্যথাটা আবার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। থাক্-থাক্ করে' দেবাশিস উঠলো চীৎকার করে'। হাতের কাজ ফেলে মনোবীণা ছুটে এলো, শক্ত করে' স্বামীকে আঁকড়ে ধরলো, মৃত্যুর মহাশূন্যে মনে-মনে যেন তাকে মাটির আশ্রয় দিলে। দেবাশিসের চোখ এসে পড়লো তা'র মুখের ওপর—শোকপাণ্ডুর অশ্রু-আচ্ছন্ন মনোবীণার এই মুখ কী ভয়ানক কুৎসিত হ'য়ে গেছে! যা-কিছুকে রোগ স্পর্শ করলো তাই দেবাশিসের মনে হয় কুৎসিত: মনোবীণার মুখেও এই রোগের পঙ্কিলতা—এই তা'র গানহারা ম্লান মুখ, এই তার উদাসীন নিষ্প্রভ দৃষ্টি! মনোবীণাকে সম্পূর্ণ আবৃত করে' অস্বাস্থ্যকর একটা ছায়া যেন সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু দেবাশিস এই দুঃসহ যন্ত্রণায়ো সেই বিরাট সৌর-মণ্ডলের গীতনৃত্য শুনতে ও দেখতে পাচ্ছে। গ্রহ-নক্ষত্রের ঐক্যতানে বেজে উঠেছে মৃত্যুর অর্কেষ্ট্রা। অজানা জগতের বিপুল উদ্বোধনী। মনোবীণা কেন তাকে এখানে আঁকড়ে ধরে' রাখতে চায়? এখানে গান্ নেই, ছন্দোচ্ছ্বাস নেই, নৃত্য-তরঙ্গিমা নেই—এখানে শুধু অস্বাস্থ্যকর অসম্পূর্ণতা,—তিলে-তিলে দেহের গোপন অপচয়।

হঠাৎ মনোবীণার দুই নোয়ানো বাহু সজোরে ঠেলে ফেলে দেবাশিস চেঁচিয়ে ওঠে: তুমি আমার কাছ থেকে সরে' যাও, দূর হ'য়ে যাও। আমাকে তুমি ছুঁয়ো না, খবরদার, কাছে এসো না কক্‌খনো। তোমাকে আমি চাই না, তোমাকে আমি কোনোদিন চাইনি।

প্রবল আঘাতে মনোবীণা দূরে ছিট্‌কে পড়ে। ব্যথায় বিবর্ণ মুখ করে' এক পাশে আলগোছে সে সরে' বসে।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে কি না দেখবার জন্যে টেব্‌লের ঘ'ড়র দিকে তাকায়। কতোক্ষণ বাদে ব্যথাটা ফের উঠলো, চার্টে পেন্সিল দিয়ে টুকে রাখে। অপারেশান্ সইবার জন্যে কবে তা'র শরীর শিগগির মজবুত হ'য়ে উঠবে তারি কথা ভেবে সে বেদানার দানা চিপে রস করতে বসে।

তীব্র, তপ্ত যন্ত্রণায় শূলবিদ্ধ সাপের মতো পাক খেতে-খেতে দেবাশিস ফের চীৎকার করে' ওঠে: না, না, তোমাকে চাইনি কোনোদিন, কোনোদিন না। তোমাকে আমি ভালোবাসি—মিথ্যা কথা। আমি মরবো, তুমি আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হ'য়ে যাও, দূর হ'য়ে যাও। বলে' তা'র মুখের কাছে তুলে-ধরা ওষুধের গ্লাসটা সে হাতের ধাক্কায় মেঝের ওপর ছুঁড়ে মারে। আরেকটা শিশি তুলে সে উঁচিয়ে ওঠে: শিগ্‌গির পালাও এখান থেকে বলছি, নইলে তোমার মাথা তাক্ করে'—

যন্ত্রণার আরেকটা মোচড় উঠতেই শিশিটা হাত থেকে মেঝের ওপর খসে' পড়ে। দেয়ালের দিকে পিঠ করে' মনোবীণা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনুচ্চার্য্য নিবিড় ব্যথায় তা'র সারা দেহ তখন কাঁপছে।

তারপর দেবাশিসের ব্যথাটা আবার জুড়িয়ে আসে। হাতের ইসারায় মনোবীণাকে কাছে ডেকে কোলের কাছে বসতে দেয়। কতোক্ষণ কোনো কথা কইতে পারে না। টোষ্টের মতো মৃদু-মৃদু গরম মনোবীণার ডান হাতখানি দিয়ে সে মুখ চেপে ধরে। তা'র আঙুলের ফাঁক দিয়ে ক্লান্ত, ব্যথিত স্বরে সে বলে: মনো, একটা গান গাইবে?

"চন্দন লেখা দ্বারে দ্বারে
চন্দনমালা দুলিছে বায়ে।"

চন্দন-সাবান

সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দন, সকল শুভ-কার্য্যের ও পবিত্রতার অঙ্গ। অতি পুরাতন হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের অবিকল গন্ধ ও রং আমাদের সাবানে প্রতিফলিত

—আমাদের সাবান—
ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস
কলিকাতা।

রসচক্র

১৬

শ্রীমনোজ বসু

সকালবেলা অকস্মাৎ শম্ভুরতন বড়বৌর ঘরে ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। বলিল—কি উৎপাত বলত! দাঁতন ভেঙে নিয়ে দাওয়ায় বসেছি, এক নম্বর এলেন বাগ্‌চী মশায়। তাঁর পিঠ পিঠ রাখাল। শেষকালে দেখি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে তিনি ভট্‌চায এসে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উঠল। ভট্‌চায বাতের বেদনায় আজ ছ'মাসের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সেও বেরিয়ে এসেছে—

শম্ভুকে একনজর দেখিয়াই বড়বৌ সিঁদারী খুলিতে লাগিয়াছিল। কিন্তু বৃত্তান্ত যে প্রকার ঘোরতর তাহার মধ্যে কাজ করা চলিল না। প্রচুর হাসিতে-হাসিতে শম্ভু বলিতে লাগিল—গতিক দেখে আমি গাড়ু হাতে উঠে পড়লাম। দাদার নজর এড়ানো দায়, ঠিক ধরে ফেলেছেন, বল্লেন, অমনি-অমনি পাড়ায় বেরিয়ে পোড়ো না যেন, শম্ভু। আমি জবাব না দিয়ে দে ছুট—

বলিয়া ছুটাছুটির ক্লান্তিতে শম্ভু একদম বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। একটু চুপ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বিভূতি শনিবারে আসছে?

নিস্পৃহভাবে বড়বৌ উত্তর দিল—তাই ত শুনছি—

—দাদাকে কোন খবর পাঠিয়েছে নাকি? কাল বিকেলে নিতাই চক্কোত্তি এসে অনেকক্ষণ কি সব বলছিল। শুনলাম, সে বিভূতির ওখানে গেছল—

বড়বৌ বলিল—কি জানি—

হুঁ—বলিয়া শম্ভু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আবার যখন কথা বলিল তখন স্বর তাহার উত্তপ্ত হইয়া গেছে। বলিল—কিন্তু কে কি বলেছে তাই নিয়ে দাদাও ক্ষেপে উঠলেন? ন'বৌমার টাকা ফেলে দিলেই ত চুকে যায়। এই মাসের মধ্যেই যেমন করে হোক আমি সমস্ত টাকা দাদার হাতে এনে দেব—এই আমি বললাম—

বড়বৌ জবাব দিল না।

শম্ভু অধীর হইয়া বলিতে লাগিল—কথা বলছ না যে দাদাকে বুঝিয়ে বলো সব—

বড়বৌ বলিল—তোমার কথা তুমি গিয়ে বলো—

—তাই পারা যায় বুঝি?—শম্ভু ম্লানমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বলবার ত কত কথাই আছে। এই যে লোকজন ডেকে জমাজমি জিনিষ পত্তোরের ফর্দ করা হচ্ছে—কেন, বিভূতি যা বলবে তাই হবে, আমি একজন শরিক নই, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়? একটা মুখের কথা না বলে আলাদা করে দেওয়া—পরম শত্রুরেও এমন করে না, আর উনি কিনা বড় ভাই হয়ে তাই করলেন—

বড় বৌ আর একটু থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শম্ভু বলিল—যচ্ছ কোথায়? শোন বৌদি, আমিও ছেড়ে কথা কইব না। আসুক বিভূতি শনিবারে, বোঝাপড়া তার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে তোমাদেরও স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, ঐ মেজকৌর ভাগে আমায় ফেলে দিয়ে তোমরা সব যে রেহাই পাবে সো'টি হচ্ছে না। আমি মতলব ভেঁজে রেখেছি—

বলিয়া ঘর কাঁপাইয়া শম্ভু প্রবলবেগে হাসিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু এদিকে চিন্তার কারণ আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইল। শনিবারে বিভূতি বাড়ী ত আসিলই না, তারপর দিন তিন-চারের মধ্যে না লিখিল চিঠিপত্র না পাঠাইল একটা কোন সংবাদ। আবার উড়ো খবর পাওয়া গেল, কলিকাতায় এই সময়টা মায়ের অনুগ্রহ বড় অধিক পরিমাণে হইতেছে। অথচ বাড়ীর কর্ত্তা শিবরতন পরম নির্বিকার

ভাবে বাঁটোয়ারা পত্রের মুশাবিদা করিতে লাগিয়াছেন। এবং বাড়ীর মধ্যে জয়া ভিন্ন অপর কাহারও যে আহার নিদ্রার তিলার্দ্ধ ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহার পরিচয় নাই।

বড়বৌর সঙ্গে আলাপ বন্ধ। গিরিবালাও ভুল করিয়া উঠানের এই প্রান্তে আসে না। তাহার উপর নিঃসন্দেহ অতি কঠোর নিষেধ জারী হইয়াছে। জয়া অগত্যা মনুর শরণ লইল। মন্মথরতন তখন অতিশয় ব্যস্ত; জামরুল-ডালে দোলনায় দুলিতে দুলিতে আনন্দাতিশয্যে চোখ বুজিয়া আছে। সেই চোখ খুলিয়া কথা শোনান নিতান্ত সহজ নয়।

জয়া অনুনয় করিতে লাগিল—লক্ষ্মী বাপ আমার, যা বলছি শোন—দুটো পয়সা দেবো—

অনেক বলাবলির পর মনু সংক্ষেপে উত্তর দিল—তুমি সরো ন'খুড়ী, কালকে যাবো—

জয়া হাসিয়া বলিল—কি পাগল ছেলে রে; এক্ষুনি দরকার—

রীতিমত বিরক্ত হইয়া মনু পলকের জন্য চোখ মেলিল। বলিল—পারবো না—

—চারটে পয়সা দিচ্ছি, লক্ষ্মী মাণিক আমার—রাখালের বাড়ী আর কতক্ষণের পথ?

লক্ষ্মীমাণিক ওৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া বলিল—দাও। এবং পয়সা কয়টি হাতে পাইয়াই লাফাইয়া পড়িয়া বায়ুবেগে ছুটিল।

চোখে চশমা আঁটিয়া শিবরতন বাগ্‌চী-মহাশয়ের সঙ্গে পুরানো দলিল পত্র বাছাই করিতেছিলেন এমন সময় রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কলকাতায় যাচ্ছি। ন'বৌদি বড্ড ধরেছেন, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শিবরতন মুখ তুলিয়া বলিল—বিভূতিকে আনতে যাচ্ছ বুঝি? এক্ষুনি যাবে?

—হ্যাঁ

গ্রহরথানেকের মধ্যে রাখাল রওনা হইয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বড় মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। জয়া প্রদীপ জ্বালিয়া একেলা ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কতক্ষণ ধরিয়া এমনি বসিয়া আছে, খেয়াল নাই। সহসা শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখে, ঠিক পিছনটিতে বিভূতি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

এক মুহূর্ত্ত জয়া বিমূঢ় হইয়া গেল। তারপর লক্ষ্য হইল, বিভূতির কাপড় জামা সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া-গড়াইয়া পড়িতেছে। কাছাকাছি কোথাও কিছু না দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া স্বামীর মাথা মুছাইল। মৃদু হাসিয়া কহিল—একটা ছাতা আনতে পারনি?

শুকনা কাপড়ের মধ্যে পাওয়া গেল একখানা চওড়া লালপাড় শাড়ী। বিভূতির দু'একখানা ধুতি যা বাড়ীতে থাকে সে সব কোথায় চাপা পড়িয়া আছে—শাড়ী বাহির করিয়া দিয়া জয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিভূতি শিহরিয়া উঠিল।—এ যে মেয়ে মানুষের কাপড়।

হুকুমের সুরে জয়া বলিল—পরো বলছি এক্ষুনি। গায়ে জল রয়েছে—।

অতএব পরিতে হইল। জয়া বলিতে লাগিল—সমস্ত পথ ভিজে এসেছ। অসুখ না করলে বাঁচি। পথে কোথাও দাঁড়ালে হত। কি রকম যেন তুমি—

বিভূতি কহিল—তাই বুঝি দাঁড়ান যায়।

—তার মানে?

—মানে আর বলে লাভ নেই। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আর জন্মে তুমি যেন পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মাও। তখনি বুঝবে—

জয়া বলিল—থামো—

কিন্তু বিভূতি থামিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল—বৃষ্টি বাদলার কথা বলছিলে জয়া, মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে—আমি তা জানতেই পারিনি। ষ্টেশন থেকে দৌড়ে-দৌড়ে এসেছি। সমস্ত পথ কেবল ভেবেছি—

জয়া বিভূতির মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিল—থাক, থাক—আর বলতে হবে না, জানতে কিছু বাকী নেই। শনিবারে আসা হল না, একখানা চিঠি দিলে বুঝি অনেক পয়সা খরচ হয়ে যেত—

—তুমি খুব ভাবছিলে, না?

জয়া ভালমানুষের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না তো—

—দেখলাম, ঠিক দুর্গা প্রতিমার মতো তুমি বসে আছ; আমি ঘরে ঢুকলাম, টেরও পেলে না—

আদরে স্নেহে স্নিগ্ধকণ্ঠে জয়া বলিতে লাগিল—তোমাকে কে টেনে এনেছে জানো মশাই? আমি—আমি—। ষ্টেশন থেকে ছুটিয়ে কে এনেছে জানো তা?···তোমার খবর নেই, এ দিকে এই কাণ্ড—কি ভাবনাটাই ভেবে মরেছি—

—এ দিকে···কি?

—কিছু না। বলিয়া জয়া চুপ করিল। কোন ক্লেদ তুলিয়া এই মুহূর্ত্তটিকে মলিন করিতে তাহার মন সরিল না।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘর-কানাচে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, সিক্ত বাতাসে ঘরের মধ্যে সেই গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

বিভূতি বলিল—খবর না দেওয়া খুব অন্যায় হয়ে গেছে জয়ী, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আফিসে অডিট হচ্ছে, বড্ড খাটুনি—

জয়া স্বামীর হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তাই কি রকম রোগা হয়ে গেছ,—চাকরী তুমি ছেড়ে দাও—

—দেবো, নিশ্চয় দেবো—সেই যোগাড়ে আছি। বলিয়া বিভূতি থামিল। একটু পরে বলিল—সমস্ত দিনের মধ্যে ফাঁক নেই। রাত্তিরে চিঠি লিখব—তা পরিশ্রমের পর একটু স্থির হয়ে বসলেই চোখ জড়িয়ে আসে।

—ঘুম আজকাল হয় তা হ'লে? জয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। নূতন বিয়ের পর যে কথাটা বিভূতি প্রায়ই বলিত তাহা মনে পড়িয়া গেল। লজ্জিত মুখে বিভূতি কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে যোগীন ডাকিল—বড়বাবু চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন, একবার ডাকছেন—।

জয়ার মুখের হাসি মুহূর্ত্তে মিলিয়া গেল। বিভূতি জিজ্ঞাসা করিল—আসতে না আসতে জরুরী তলব। ব্যাপার কি জয়া?

জয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

বিভূতি মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার চোখ দুটি ছলছল করিতেছে। গভীর স্নেহে জয়ার মাথাটি বুকের উপর তুলিয়া লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কি হয়েছে বলবে না আমায়?

জয়া কথা কহিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া অব্যক্ত স্বরে কহিল—আমায় ওঁরা ত্যাগ করেছেন—

—সে কি?

জয়া বলিতে লাগিল—বাড়ীর মধ্যে কেউ আমায় দেখতে পারে না। আমারই যেন যত দোষ। কথায়-কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া, বিনিদোষে আমায় অপমান করে—। তারপর চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল—আমার একটা কথা তুমি রাখবে?

বিভূতি কিছু না বলিতেই অধীর হইয়া জয়া বলিতে লাগিল—বড় গিন্নি আমায় বেহদ্দ অপমান করলেন। ব্যাপার কি? না—কয়েকটা বাঁশের পাতা। বলিতে বলিতে বিভূতির হাত ধরিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল—তুমি আমায় একটা ভিক্ষে দাও—

ব্যথিতভাবে বিভূতি বলিল—তোমার অপমানে আমারও অপমান হয়, জয়া। তুমি অমন কোরো না। কি করতে হবে, আমায় বল।

জয়া বুঝাইতে লাগিল—এতদিন আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে খাচ্ছিল—এখন ভাগ দিতে গিয়ে বড় বাজছে বড় গিন্নির। তাই এত কথা ওঠে।

বিভূতি ঘাড় নাড়িল।

—কর্ত্তা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা নিয়ে ডাকছেন। তুমি মুখের উপর বলে দিয়ে এস, আমরা চাইনে ওসব কিছু। বাঁশ-বাগানের ত্রিসীমানায় আমরা যাব না। বড় গিন্নি দশ হাত মেলে ভোগ করুন!

মৃদু হাসিয়া বিভূতি কহিল—এতে কি বড় গিন্নি খুব জব্দ হবেন মনে কর?

জয়া হাত মুখ নাড়িয়া কহিল—এ না করলে কি তিলার্দ্ধ এ বাড়ীতে আমায় টিঁকতে দেবে? কম শত্রুতা করছে? তুমি জান না, তাই। আজ ছ'দিন গিরিকে আটকে

রেখেছে, এ মুখো হতে দেয় নি। বলিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিতে লাগিল—কি হবে এই ছাই-ভস্ম নিয়ে? আমাদের কি দু-পাঁচটা ছেলে মেয়ে আছে? কার জন্যে কথা শুনতে যাবো? দু'জন আমরা, না হয় ভিক্ষে করবো। আমি এ সব সইতে পারছিনে। পায়ে পড়ি, তুমি আমার কথা শোন। বলিয়া সত্যসত্যই বিভূতির পা জড়াইয়া ধরিল।

হাত সরাইয়া দিয়া বিভূতি বলিল—তাই হবে, জয়া। একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে আবার বলিল—তুমি যা বললে তাই করব। এখানে না থাকতে চাও, তার ব্যবস্থাও করতে পারব।

স্নেহে শ্রদ্ধায় গলিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিমুখে জয়া বলিতে লাগিল—তাই হয় বুঝি। বাপের বাড়ী দু'চার দিন থাকি সে এক কথা। তা বলে মৈত্র বাড়ীর বৌয়ের আর কোথাও বসতি করবার জো আছে? সে হয় না। না মরলে নিস্তার নেই। নইলে আর ভাবনা ছিল কি?

১৭

ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় চোখ মেলিয়া জয়ার মনে হইল সমস্ত বুকখানা একেবারে পালকের মতো লঘু হইয়া গেছে, ক'দিন ধরিয়া যে দুর্ব্বিসহ পীড়নে ভিতরে-ভিতরে অন্তর নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতেছিল—তাহার এক বিন্দু আর অবশিষ্ট নাই। পাশের মানুষটির তখনও চেতনা নাই। মুহূর্ত্তকাল জয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর আস্তে-আস্তে পদপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া চলিয়া যাইতেছে—

পিছন হইতে বিভূতি ডাকিল—পলাও কেন—ও জয়া, আশীর্ব্বাদটা নিয়ে যাও। অর্থাৎ তাহার সকল কীর্ত্তি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। জয়া ছুটিয়া পলাইল।

ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি যে কোথায় যাবে বলেছিলে, খাবার খেয়ে তারপর যাবে ত?

বিভূতি শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল—ইস্ রোদ উঠে গেছে···খাওয়া দাওয়ার সময় হবে না আর।

জয়া জেদ করিয়া বলিল—তা হোক। কুটুম্বের বাড়ী উদ্যুগ আয়োজন করতে দেরী হয়ে যাবে, পৌঁছুতেও বেলা হবে।···আচ্ছা, মা যে মায়ার বিয়ের জন্যে এর মধ্যে অত ব্যস্ত উঠলেন।

—কি জানি, হয়ত ভাবলেন উনি ব্যস্ত না হলে যদি দিদির মতো শেষকালে মায়া নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—

—তোমার গলা ধরে বলতে গেছলাম কি না যে আমি খুব ব্যস্ত হয়েছি। বলিয়া বড় রাগ করিয়া হাসিমুখে জয়া বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে মেজবৌ আসিয়া রান্নাঘরে জয়ার কাছে পিঁড়ি টানিয়া বসিল। বলিল—ঠাকুরপো কোথায়?

জয়া জানাইয়া দিল, বাড়ীতে নাই।

—কি কাণ্ড করেছে শুনেছিস?

নিরুপায়ের ভাবে জয়া বলিল—কত শুনব মেজদি, ওঁকে নিয়ে আর পারা গেল না—।

—শুনিস নি নিশ্চয়। তা হলে আর অমন হাসতে হত না। কাল বট-ঠাকুরকে নাকি বলে দিয়েছে বাঁশঝাড় বাগবাগিচা কোন কিছুর ও ভাগ নেবে না। গ্রামের দশজনের সামনে কথাবার্ত্তা হয়েছে। ঠাকুরপো নাকি বট-ঠাকুরের পায়ে ধরে সাধাসাধি করেছে।—

এত বড় সংবাদেও জয়ার হাসিমুখ একবিন্দু মলিন হইল না দেখিয়া মেজবৌ বলিল—বিশ্বাস করলি নে বুঝি।

অসঙ্কোচে জয়া উত্তর করিল—কেন করব না। ও সব করতে পারে, মেজদি।

মেজ বৌ বলিতে লাগিল—ঠাকুরপো এলো, তা আমায় একটা খবর দিতে হয়। আমি এসে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে যেতাম। তা হলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়।

জয়া তেমনি হাসিয়া বলিল—আমার মনে ছিল না।

যোগীন আসিয়া বলিল—ন'মা, শোন—

বলিয়া আগাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া মাটির উপর মুখ-বাঁধা লাল থেরোর একটা থলি রাখিয়া কহিল—বড়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

এরূপ ঘটনা নূতন নয়। আবাদের বাঁধবন্দী ও অন্যান্য

ব্যাপারে মাঝে-মাঝে সদর সেরেস্তা হইতে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক হয়। সে টাকা পৃথক করিয়া শিবরতন চৌধুরী বাড়ী হইতে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতেন, পরে মফস্বলের বরকন্দাজ আসিয়া লইয়া যাইত। লোহার সিন্দুক থাকিত জয়ার ঘরে ; সে যখন এখানে থাকিত শিবরতন সরকারী টাকা ন' বৌমার কাছে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

জয়া এক নজর চাহিয়া বলিল—নিচ্ছি, একটু দাঁড়াও যোগীন। তারপর আবার বলিল—গিরি কোথায়? তা'কে না হয় একটু ডেকে দাও, বাবা। আমার হাত জোড়া, সে এসে তুলে রাখুক।

মেজবৌ ব্যস্ত হইয়া বলিল—গিরিকে কি হবে? আমি যাচ্ছি, বৌদি। চাবি কোথায় বলে দাও—আমি রেখে আসব।

জয়া হাসিয়া বসিল—চাবি কি তুমি খুঁজে পাবে মেজদি? পোর্ত্তারমুখী কোথায় রেখে গেছে সেদিন, আর পেলেও তুমি চাবি চিনতে পারবে না।

যোগীন বলিল—বড়বাবু বল্লেন, এখন আর হয়ে উঠল না। আজকে সন্ধ্যের মধ্যে সব টাকা শোধ করবেন।

কাজ ফেলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জয়া যোগীনের দিকে চাহিল। বলিল—বটঠাকুর কি বলেছেন? এ কিসের টাকা?

যোগীন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল—এই চার শো পাঠিয়ে দিলেন ; আর টাকা সন্ধ্যের সময় দেবেন।

আগের দিন রাত্রিতে বিভূতির সঙ্গে শিবরতনের অনেক আলোচনা হইয়াছিল এবং দু'ভাইয়ের এই আলোচনা নিতান্ত চুপি চুপি হয় নাই। অনেক কথাই বাড়ীর ভিতরে জয়ার কানে পৌঁছিয়াছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জয়া বলিল—বটঠাকুর বুঝি বাঁশ ঝাড়ের দরুণ দাম পাঠিয়ে দিলেন, যোগীন।

যোগীন বলিল—তা আমি বলতে পারি নে—

জয়া আরও উচ্চ উগ্র ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলিল—ওঁদের বোলো যোগীন, বাঁশঝাড় আমরা বিক্রী করি নি, দান করেছি।

কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। শিবরতন বাহির বাড়ীতে ছিলেন, ইতিমধ্যে কোন সময় তিনি নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। শিবরতনই কথা কহিয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বরে এক বিন্দু উত্তাপ নাই, অতিশয় শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—বাঁশ-ঝাড়ের দাম নয় ন'বৌমা, তোমার কাছে আমার যে সাত শ' টাকা দেনা রয়েছে! বিভূতির টাকার বড় দরকার। তবু সব এখনো যোগাড় হল না। সন্ধ্যের সময় রাজেশ্বরের কাছে একবার যাব। আজকের মধ্যেই সমস্ত গেয়ে যাবে, মা।

ক্ষণকাল অভিভূতের মতো জয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। হঠাৎ উঠিয়া জোরে-জোরে পা ফেলিয়া ঘরে ঢুকিল। তারপর সিন্দুক খুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া টাকা গণিয়া-গণিয়া তুলিয়া আরও অনেক পরে আবার যখন যে বাহিরে আসিল তখন তাহার দুটি চোখ জবাফুলের মতো রাঙা হইয়া গিয়াছে।

মেজবৌ তখনও চলিয়া যায় নাই। জয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—দেখলে মেজদি? এমন ভাসুর কোন জন্মে কারো না হয়।

মেজবৌ ভালমন্দ জবাব দিতে না দিতে আবার জয়া বলিতে লাগিল—মাথায় জুতো তুলেও ক্ষোভ মেটেনি। এমনি করে শাস্তি দিচ্ছেন। সেই যে সেদিন কথা কাটাকাটি হয়েছিল। বলিতে-বলিতে সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল—আচ্ছা, গিরি যদি ঝগড়া করত তাকে কি ওরা এমনি করে ঠেলতে পারত?

মেজ বৌ বলিল—আমি চিনি সবাইকে। তোরাই না কেবল ওদের জন্যে মরিস। কালকে কি কাণ্ড করলে বল দিকি। মেজ বাবু ত আমাদের দাদা বলতে অজ্ঞান, ভাবতাম ঠাকুরপোর বুদ্ধি জ্ঞান আছে। কিন্তু ও পাটোয়ারী মানুষের সঙ্গে পারবে কে? চৌধুরী সেরেস্তায় চিরকাল পরের ফাঁকি দিয়ে এসেছেন, এবার নিজের ভাইদের ধরেছেন।

জয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা নয়। তা হলে না হয় বুঝতাম। ওদের রীতি আর এক রকমের। বলিয়া সে সজল

চক্ষে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বলিল—সে ত সরল মানুষের গোজা কাজ হ'ত, মেজ দি। বুঝতাম যে দৈতৃক সাত বিঘে ব্রহ্মোত্তর থেকে একটা মানুষ নিজে খেটে এই সব করেছে—তার জিনিষ এখন সে ফিরে নিচ্ছে। কিন্তু এ কি অন্যায়? মায়ের শ্রাদ্ধের দেনার টাকা। মা কেবল একলা তাঁরই ছিল এই কথাই কি বট-ঠাকুর ভেবে রেখেছেন?

১৮

মাথায় চাদর বাঁধা, হাত তিনেক অন্তর পা ফেলিতে-ফেলিতে রাখালচন্দ্র উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ চোখ রোদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে বলিল—খুঁজে পেলাম না, বৌদি—

জয়া বলিল—তুমি বোসো ঠাকুরপো, ঠাণ্ডা হও। ছুটিয়া সে পাখা লইয়া আসিল।

রাখাল বলিল—বিভূতি দা, কলকাতায় নেই—

মৃদু হাসিয়া জয়া বলিল—তা জানি। তোমায় কেবল অনর্থক কষ্ট দিলাম।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—জানেন? সে যে বড্ড গোপন খবর, কি করে জানলেন বলুন ত? তারপর যেন বড় এক সমস্যার সমাধান করিয়াছে এমনিভাবে বলিল—বিভূতি দা চিঠি লিখেছিল, না?

—না।

—তবে জানেন ছাই। আচ্ছা, বলুন ত তিনি কোথায়?

জয়া হাসিয়া কহিল—বাড়ী।

অধিকতর বিস্ময়ে রাখাল বলিল—বাড়ী এসেছেন? কবে এলেন বাড়ী?

—কাল।

—তার আগে কোথায় ছিল বলতে পারেন?

জয়া বলিল—ঝামাপুকুরে কিম্বা আফিসে।

রাখাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—আপনি কিচ্ছু জানেন না, বৌদি। শুক্রবার থেকে বিভূতি দা আফিসে যান না।...ঐ যাঃ সব কথা বলে ফেললাম।

জয়া বলিল—দোষের কথা আর কি। ওঁর শরীর যা হয়েছে—কলকাতায় থাকলে আমি আফিসে যেতে দিতাম নাকি?

রাখাল চিন্তিতের সুরে বলিতে লাগিল—ও কথা নয়, সে আর এক কথা। ব্রাহ্মণ সন্তানের কাছে কথা দিয়ে এসেছি—আপনার বাপের বাড়ীর সরকার বিষ্ণুদাস বাবু। বলে ফেলে বুড়ো বেকুব। রাস্তার মোড় অবধি এসে হাত ধরে ফেল্লেন, কাউকে প্রকাশ না করি।

জয়া বলিল—এখনো ত তা বল নি, তবে আর ভাবনা কি?

প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে রাখাল বলিল—সে বলা যায় না। ব্রাহ্মণের গা ছুঁয়ে বলে এসেছি।

জয়া হাসিয়া বলিল—না ই বা বললে ঠাকুরপো,...কিন্তু শুধু মুখে যেন চুলে যেও না। আমি আসছি, দাঁড়াও—।

কিন্তু রাখালের চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এমন কি জয়ার এমন মনোরম প্রস্তাবেও আগ্রহ দেখাইল না। বলিল—যাবেন না, বৌদি। আচ্ছা, আপনাকে না হয় বলি কথাটা। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, বিভূতি-দাকেও না। বুঝলেন ত?

জয়া বলিল—কাজ নেই ভাই, ব্রাহ্মণের কাছে সত্য করে এসেছ।

রাখাল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—আপনাকে বললে দোষ হবে না। আর কাজটা বিশেষ করে আপনারই। বড্ড আনন্দের খবর—আপনি জমিদার হয়ে যাচ্ছেন, সত্যি-সত্যি জমিদার। কালেক্টরীতে খাজনা গুণতে হবে ঠিক চৌধুরী বাবুদের মতো—

জয়া অবাক হইয়া গেছে দেখিয়া রাখাল হাসিয়া বলিতে লাগিল—বুঝতে পারলেন না? নিতাই চক্কোত্তির জমিদারী কেনা হল। শুক্রবার সকালে নিতাইএর সঙ্গে বিভূতিদা মহাল দেখতে বেরিয়ে ছিলেন। আজকে ত একুশে ; আজকে সদরে রেজেষ্ট্রী হবার কথা। পুরুষমানুষের নামে হলে ফ্যাসাদ অনেক, ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা ওঠে, তাই আপনার নামে কবলা হচ্ছে।...কিন্তু খবরদার, কথা প্রকাশ না হয়—আমি ব্রাহ্মণের কাছে দিব্যি করে এসেছি।

মুহূর্তকাল জয়া অভিভূত হইয়া গেল, কথা বলিতে পারিল না। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল—এতক্ষণ তা হ'লে আমি জমিদার হয়ে গেছি। কি বল ঠাকুর-পো?

ফিস্ ফিস করিয়া রাখাল বলিল—আস্তে বৌদি, কথাটা জানাজানি না হয়। বিভূতিরা এত চুপি চুপি কাজ করছে; আপনার মা আর বিষ্টু দাস বাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। আর জেনেছি আমি। ব্রাহ্মণ সন্তান আমায় অতি বড় দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন।

বিভূতি অনেক রাতে ফিরিল। জয়া জাগিয়া বসিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিল—ছেলে কেমন দেখলে?

বিভূতির বোধ করি নিদ্রা আসিয়াছে। প্রথমটা জবাব দিল না। বার দুই তিন প্রশ্নের পর জড়িত স্বরে বলিল—মন্দ নয়।

—রঙ কেমন?

—ফর্শা!

বয়স কত?

বিভূতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—না, ঘুমুতে দেবে না দেখছি। কি কি জানতে চাও বল, একসঙ্গে জবাব দিয়ে তারপর ঘুমবো।

রাগে দুঃখে জয়ার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বলিল—ঘুমোও তুমি আমি শুধু একটা খবর দিই তোমাকে। ভাল খবর। বটঠাকুরের সাতশো টাকা আদায় হয়ে গেছে।

বিভূতি প্রশ্ন করিল—কোন্ টাকা? তারপর মনে পড়িয়া গেল, এই টাকা লইয়া কত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বলিল—হঠাৎ দাদার এ খেয়াল কেন? আর এত টাকা পেলেনই বা কোথায়?

জয়া কঠোর স্বরে বলিল—হয়ত দিদির গহনা বন্ধক পড়েছে, হয়ত ভাগের জমি বিক্রি করেছেন। কিন্তু সে ত আমাদের জানবার কথা নয়। আমাদের এখন টাকা চাই —যা ধার দেওয়া ছিল আদায় হয়ে গেছে! বাস।

বিভূতি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তা' হলে দাদা শুনেছেন, তুমিও শুনেছ?

জয়া কথা কহিল না।

মৃদু হাসিয়া বিভূতি বলিল—কি কি খবর শুনেছ, বলো না।

হাসি দেখিয়া জয়ার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। উত্তপ্ত-স্বরে বলিল—খবর চমৎকার। আমি জমিদারী কিনেছি—

—অতএব তোমাকে এখন থেকে সমীহ করে কথা কইতে হবে, ভাবে ভঙ্গীতে এই কথা বলতে চাও? বিভূতির হাসি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

জয়া রাগিয়া মুখ ফিরাইল। বিভূতি মুখ তুলিয়া ধরিতে এক ঝাঁকিতে তাহার হাত সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল—কেন মিথ্যে বলেছিলে আমায়? তোমায় বাড়ী টেনে এনেছে নিতাই চক্কোত্তি, আমি নই। এ বাড়ী থেকে আমায় আর কোথাও নিয়ে যাও, আমি এখানে আর থাকব না।

বিভূতি বলিল—কিন্তু এরকম ত কথা ছিল না, কাল রাত্রে মৈত্র বাড়ীর বৌ হিসেবে অনেক রকম সাধু প্রস্তাব হচ্ছিল।

জয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আমি মৈত্র বাড়ীর বৌ। এই ভিটের উপর যা কিছু আসবে, দশজনে একসঙ্গে মিলে-মিশে খাবার কথা। জমিদারী ভোগ করা এখানে আমার পোষাবে না—। বলিতে বলিতে টপ্ টপ্ করিয়া তাহার গাল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বিভূতি সে অশ্রু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। হাসিমুখে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতে লাগিল। তারপর গভীর-স্বরে কহিল—জয়া, মৈত্র বাড়ীতে আমারও জন্ম। কিন্তু তার চেয়ে আরও ভাগ্যের কথা, তোমাকে আমি পেয়েছি। শাশুড়ী ঠাকরুণের পরামর্শ ছিল অন্যরকম। কিন্তু কালকে ঐ বাঁশঝাড় নিয়ে বড় গিন্নিবে তুমি যে রকম জব্দ করেছ তাতে, আর সেটা করতে সাহস হল না। দলিলের মুশাবিদাটা তুমি একবার দেখ তাকিয়ে—

বলিয়া দলিল আনিয়া সামনে দিল। প্রদীপের ম্লান আলোয় জয়া দেখিল, নিতাই চক্রবর্তী সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশ-কবলা পত্র সম্পাদন করিয়া দিতেছে—গৃহাধ্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী, শ্রীমতী চন্দ্রাবালা দেবী ও শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী দেবা—মৈত্র বাড়ীর তিনটি বধূই।

সজল-চক্ষে স্নিগ্ধ হাসিয়া জয়া বলিল—তাহ'লে এ ঢাকাঢাকির দরকার কি ছিল?

বলছি—বলিয়া বিভূতি জয়াকে পাশে টানিয়া বসাইল। বলিল—কিন্তু এত যে পরিশ্রম করে তোমাদের জমিদারী কিনে দিলাম, তার ব্রাহ্মণ-বিদায়টা কি হবে আগে বলে দাও।

—ক্রমশঃ

জন গল্‌সোয়ার্দি

জন গলসোয়ার্দির মৃত্যু হয়েছে—ইংরেজের পক্ষে অল্প বয়েসেই, বলতে হবে। হার্ডির মৃত্যুর পর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কারের টাকাটা সুইডেনের রাজা নিজ হাতে সম্মানিতকে দান করেন; কিন্তু সে-সম্মান গ্রহণ করতে ষ্টকহল্‌ম যাওয়া গল্‌সোয়ার্দির ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি। ব্রিটিশ লেখকদের মধ্যে আর যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন কিপলিং, ইয়েট্‌স, বার্ণার্ড শ—আর যদি আমাদের নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে ধরা যায়। কোনো এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় কারণে টমাস হার্ডি বুড়ো বয়েস অবধি বেঁচেও এ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। নোবেল প্রাইজের কর্তাদের মতিগতি বোঝা ভার।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অগস্ট গল্‌সোয়ার্দির জন্ম হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের ইংরেজ ছেলেদের সাধারণত যেমন শিক্ষা হ'য়ে থাকে, গল্‌সোয়ার্দিরও তা-ই হয়েছিলো। হ্যারো, অক্সফোর্ড। ১৮৯০-তে তিনি ব্যারিস্টর হ'য়ে কলেজ থেকে বেরোন।

ব্যারিস্টর হ'য়েও তিনি কখনো প্র্যাক্‌টিস করেন নি—কি হয় তো পসার জমাতে পারেন নি। ১৮৯৫ থেকে তিনি লিখ্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁর নিজস্ব কিছু সম্পত্তি ছিলো বলে' লেখ্‌বার বিশেষ-কোনো তাগিদ ছিলো না। প্রথম তিনখানি নভেল তিনি John Sinjohn এই ছদ্ম-নামে প্রকাশ করেন। সে-সব লেখা থেকে তাঁর অর্থাগম বা যশ কিছুই বিশেষ হয় নি। হ'বার কথাও নয়; প্রথম দিককার তাঁর সে-সব লেখা অত্যন্ত দুর্বল।

১৯০৫-এ তিনি বিয়ে করেন, এবং এই সময় থেকেই তাঁর প্রকৃত সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়। দাম্পত্য-জীবনে পরম সুখী হ'য়ে তিনি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত নানারকম কুসংস্কারকে খণ্ডন করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিরন্তর অনুপ্রেরিত করতেন তাঁর কাজে, নানাভাবে সাহায্য করতেন, পাণ্ডুলিপি টাইপ করে' দিতেন, লেখা-সম্বন্ধে দিতেন মূল্যবান্ পরামর্শ। শেষ বয়েস পর্যন্ত তিনি কোনো লেখা ছাপতে পাঠাবার আগে তাঁর স্ত্রীর সমালোচনা সশ্রদ্ধভাবে শুনতেন ও সে-অনুসারে পরিবর্তনাদি করতেন।

তাঁর প্রথম ভালো উপন্যাস 'The man of Property' বেরুলো ১৯০৬-এ। এই বইয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত ফোর্‌সাইট পরিবারের সূত্রপাত করলেন। মাঝখানে কতগুলো নাটক লিখে তিনি তাঁর ফোর্‌সাইট গল্পের জের টেনে আন্‌লেন দুটো বইয়ে—'In a Chancery' আর 'To Let'। এই তিনটি নভেল আর দুটি অতি সুন্দর interlude মিলে তৈরি হ'লো তাঁর ফোর্‌সাইট সাগা।

তিনি যদি ফোর্‌সাইটদের 'অমর করে' থাকেন, তাঁকেও ফোর্‌সাইটরাই অমর করবে বলে' আশা করা যায়। 'সাগা' শেষ করে'ও তা'দের তিনি ছাড়তে পারলেন না—তাঁর কল্পনায় তা'রা বেঁচে চল্‌লো, বেড়ে চল্‌লো। ১৯২০ থেকে আবার তা'দের নিয়ে পড়লেন—'The White Monkey' 'The Silver Spoon', সর্বশেষে 'Swan Song'। এই তিনটি বইয়ের তিনি সম্মিলিত নামকরণ করেছিলেন, 'A Modern Comedy'। ফোর্‌সাইট-নাটোর উপর যবনিকা টেনে দিয়েও তিনি তা'দের মায়া কাটাতে পারেন নি; এই সেদিনও 'On Forsyte Change' নামে এক গল্পের বই বার করেছিলেন—বিভিন্ন ফোর্‌সাইটদের জীবনকাহিনীর ছোট-ছোট পাদটীকা। 'A Modern Comedy'র দুটি interlude আছে। এই interlude-গুলো এক আশ্চর্য ব্যাপার। 'An Indian Summer of a Forsyte' আর 'Passer-by'

দুটি গল্প-কবিতা—গল্‌সোয়ার্দির সমস্ত লেখার মধ্যে অমন নিছক সুন্দর আর-কিছু নেই।

ফোরসাইট উপন্যাসগুলি গল্‌সোয়ার্দির এক বিরাট কীর্ত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে আরম্ভ করে' ১৯২৭-এ General Strike-এর বছর পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীর ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের ইতিহাস, বলা যায়। মাঝখানে মহাযুদ্ধ—সেটার উল্লেখ তাঁর লেখায় নেই; একলাফে সেটা পার হ'য়ে গিয়ে তিনি যুদ্ধের পরবর্ত্তী সমাজের ছবি এঁকেছেন। এতে তাঁর বইয়ের সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

যদি কেউ ইংরেজের চরিত্র জানতে চান, তিনি যেন এই ফোরসাইট উপন্যাসগুলো পড়েন। ফোরসাইট মানে ইংরেজ, ফোরসাইট মানে নিরেট মধ্যবিত্ততা, স্থূল কল্পনাহীনতা, গতানুগতিকতা, সর্ব্বোপরি তীব্র সম্পত্তিবোধ—sense of property। এই sense of property সোম্‌স্ ফোর্‌সাইটের মধ্যে মূর্ত্তিমান—আর সেই বেনে-মনকে যা প্রতি মুহূর্ত্তে এড়িয়ে যায়, অস্বীকার করে' যায়, তা হচ্ছে বিশ্বের সৌন্দর্য্য যার প্রতিমা আমরা দেখ্‌তে পাই নারীতে, গল্‌সোয়ার্দির আইরিনিতে।

নাট্যকার হিসেবেও গল্‌সোয়ার্দির যথেষ্ট কৃতিত্ব। তাঁর প্রথম দিককার নাটক 'Justice' Silver Box' প্রভৃতিতে সমস্যাটা এত প্রধান যে তা আমাদের রসবোধে একটু ঘা দেয়। 'Justice' নাটকে দু'পক্ষের দু' উকীলের দীর্ঘ বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। ঐ নাটকেই একটা আশ্চর্য্য ট্যাব্লো দৃশ্য আছে; জেলখানার খুপ্‌রির মধ্যে আসামী—তা'র প্রতি ছোটখাটো অঙ্গভঙ্গীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বর্ণনা—একটি কথা নেই। এই নাটক অভিনীত হবার পর ইংলণ্ডের কয়েদি সম্পর্কিত আইনকানুনের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছিলো। কয়েদির জীবন গল্‌সোয়ার্দির মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো—তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'Escape' তা'র চরম ফল। তাঁর শেষ নাটক 'The Rof' একেবারে নতুন ধরণের—আর তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

গল্‌সোয়ার্দি ইংলণ্ডকে খুব ভালোবাস্‌তেন। তিনি প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত লেখারই setting ইংলণ্ড—শুধু ফোর্‌সাইট সাগার একটা ছোট অংশ Spain-এ আছে। বছর চারেক আগে তাঁর দেশ তাঁকে Order of Merit উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলো।

অঙ্গ বর্ণে সৌন্দর্য্য সম্পাত করিতে "অঙ্গ-রাগ" সাবানের তুলনা নাই। অঙ্গরাগ সাধারণ সাবানের ন্যায় অঙ্গের কোমলতা নষ্ট করে না—ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

ফেনকা শেভিং ষ্টিক্

ফেনকার সুরভিত ফেনপুঞ্জ ক্ষৌর-কর্ম্মে সত্যই আনন্দ দান করে। যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ষ্টেশনারের কাছে যদি না পান, আমাদের চিঠি লিখিতে বলুন।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্
২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

সম্পাদক
প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৯নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা